বুবু

খাদিজা আখতার রেজায়ী

বুবু

একটি মর্মস্পর্শী জীবনের উপাখ্যান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বুবু

একটি মর্মস্পর্শী জীবনের উপাখ্যান

খাদিজা আখতার রেজায়ী

বাড পাবলিকেশন্স
১২/১৩, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

বুবু
খাদিজা আখতার রেজায়ী
প্রকাশক
এ. বি. এম. সালেহ উদ্‌দীন
বাড পাবলিকেশন্স
১২/১৩,প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
©
লেখিকা
প্রকাশকাল
বইমেলা- '৯৬
প্রচ্ছদ
প্রবাল
বর্ণবিন্যাস
জিসী কমপ্রিন্ট
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার,ঢাকা-১১০০
পরিবেশক
গ্রন্থ মালঞ্চ
১২/১৩,প্যারীদাস রোড,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মূল্য
৫০ টাকা

ISBN 984 482 073 1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জীবনসাথী সুলেখক ও গবেষক
মুনিরউদ্দীন আহমদকে

www.pathagar.com

এই লেখিকার অন্যান্য বই

মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
রাণী এলিজাবেথের দেশে
নির্বাচিতার কলাম
তিনতলার সিঁড়ি
নুরী

www.pathagar.com

বুবু,

একটা মজার খবর বলার জন্যই তোকে এ চিঠি লিখছি। ঘটনাটা এমনিভাবে ঘটে যাবে আমি কখনো ভাবতে পারিনি। জীবনে মানুষ তো কতো কথাই বলে, তাই বলে কোনে কথা যে, এমনি হুবহু বাস্তব হয়ে দেখা দিতে পারে তা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। তাই তো আজ প্রায় বাইশ বছর পর তোর কাছে লিখবো বলে কলম ধরেছি।

বাইশ বছর কি কম কথা! আজ থেকে বাইশ বছর আগে তোর সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। উর্দু সিনেমায় যেভাবে ওরা বলে—'আজ ছে বাইছ সাল পহেলে--'

তুই কেমন আছিস বুবু? কতোদিন তোকে দেখিনি! তোকে 'তুমি' সম্বোধন করা উচিত ছিল, কিন্তশ্চ তুই যদি আমার 'তুমি' সম্বোধন শুনে আমাকে চিনতে ভুল করিস! আম্মা কতো রাগ করতেন, কতোবার গাল টেনে ধরেছেন—'কতোবার বলেছি না, ওকে তুমি করে বলবি। ও তোর ক' বছরের বড় জানিস? পুরো তিন বছরের বড়!'

কিন্তশ্চ আমি কোনোদিন তোকে 'তুমি' বলে ডাকতে পারিনি। 'তুমি' বলে ডাকা তো দূরের কথা, আমি কি তোকে কম মেরেছি! রাগ হলেই দাঁত কিড়মিড় করে তোর গালে আঁচড় মারতাম, হাত খামছে দিতাম। আম্মা তোর গায়ে দাগ দেখলেই প্রশ্ন করতেন– 'এগুলো কিসের দাগ? কার সাথে মারামারি করেছিস, কে তোকে খামছি দিয়েছে?'

তুই কখনো আমার নাম বলিসনি। কখনো--'জাংলা থেকে কুমড়ো বা সীমের ডাটার আঁচড় লেগেছে, অসাবধানে নিজেরই নখ লেগে গেছে, বলে আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছিস্।

সত্যিই বুবু, তোর মতো মানুষ হয় না রে!

তোর কি আমার কথা মনে আছে? তুই কি এখনো আমাকে আগের মতো ভালোবাসিস?

তোর কথা যখনই মনে পড়ে, আমি হারিয়ে যাই অতীতে, দূর অতীতে। মনে পড়ে হাজারো স্মৃতি!

দু'টি বোন, দু'টি প্রাণ!

একই দিনে, একই সাথে দু'জোড়া পালকি এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের ঘরের সামনে। ফুলে ফুলে সাজানো পালকী!

আরো দূরে, আরো অতীতে ঘুরে আসে ভাবনাগুলো! স্মৃতির কন্দরে ভেসে ওঠে গাঁয়ের মেঠো পথ। দূর থেকে দেখা যেতো সিরাজ মামা আসছেন। আমরা দু'জন একত্রে দৌড়ে যেতাম। প্রতিযোগিতা, দৌড়ে গিয়ে কে আগে মামাকে ছুঁতে পারে।

তুই সর্বদাই একটু কমজোর ছিলি। আমার সাথে দৌড়ে জেতা তোর পক্ষে কখনো

www.pathagar.com

সম্ভব হয়নি। আমি 'শা' করে দৌড় মারতাম। মামাকে ছুঁয়ে দেবার আগেই মামা দু' হাতে আমাকে আগলে তুলে কোলে নিতেন, আর তখনো ট্যাং ট্যাং করে তুই অনেক পেছনে পড়ে থাকতি। মামাই এগিয়ে এসে তোকে তুলে নিয়ে দু'জনকে দু'কোলে নিতেন।

তোর কি মনে আছে এসব কথা!

তোকে কতো কথা বলা হয়নি! তুই কি জানিস, তোর ছেলেবেলার বন্ধুরা কে কেমন আছে?

জানিস, আমাদের পাশের বাড়ীর নানাভাই মারা গেছেন। মারা তো যায় কতো লোকই, কিন্তু নানাভা'ইর মতো করুণ মৃত্যু ক'জনের হয়!

মিনুকে মনে পড়ে তোর? মিনুর জীবনে কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল তা কি জানিস?

খুশু আর নুসু, ঐ যে দু'বোন, চাচাতো বোন!

সেই নুসু- খুশুর ঘটনা কি কেউ তোকে বলেছে?

হায় আল্লাহ! তুই দেখি কিছুই জানিস্ না বুবু!

আরে! আসল ঘটনা যেটা তোকে শুরুতে বলতে চেয়ে লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম তা তো তোকে এখনো বলাই হয়নি। আসলে বাইশ বছরের ব্যবধানে কথা এতো জমে গেছে যে, কোন্ দিক থেকে শুরু করি—কোন্টা রেখে কোন্টা বলি—আমি যেন দিশেহার হয়ে গেছি!

আমাকে নিয়ে তোর অনেক চিন্তা ছিল; কিন্তু তোর জীবনে কতোটুকু সুখ ছিল?

রমজান মাসে রোজা রেখে তোকে তোর বরের জন্য দুপুরবেলা রান্না করতে হতো। এরপরও সন্ধ্যায় দশ/বারো রকম ইফতারী বানাতে হতো তোকে। কারণ তোর বর রোজা না রাখলেও বন্ধুদের নিয়ে ইফতারী সাজিয়ে সাইরেনের অপেক্ষা করতে খুব পছন্দ করতো। তুই নীরবে তাই করতি—যা সে পছন্দ করতো। তোর মতো ধৈর্য আমি খুব কম মেয়ের দেখেছি বুবু। তারপরও তোর চিন্তা ছিল আমাকে নিয়ে।

তোর বর নম্র ছিল, ভদ্র ছিল, সদালাপী ছিল; কিন্তু কখনো বুঝতে পারিনি তোর সাথে কেন এমন খারাপ ব্যবহার করতো! সবার চোখে সে মডেল হয়ে থাকতো বলেই তোর সাথে তার অভদ্রজনোচিত আচরণকে আমি সহজভাবে মেনে নিতে পারতাম না।

নানান ধরনের অসুখ ছিল তোর বরের। অনেক কিছু বেছেগুছে খেতে হতো তাকে। আমার এখনো মনে পড়ে, তুই রাতে চিড়ে ভিজিয়ে দৈ পেতে রাখতি। তোর ঐ ভেজানো ফুলে ওঠা চিড়ে-দৈ দিয়ে গুড়ের সাথে মাখিয়ে তাকে খেতে দিতি। ডাক্তার নাকি বলেছিল, এভাবে খেলে তার শরীরের কষা ছেড়ে যাবে।

কথায় কথায় ইংরেজী বলা তোর বরের আরেকটা অভ্যেস ছিল। দৈ-গুড়ে মাখা চিড়ের বাটিটা সামনে নিয়ে এক চামচ মুখে দিয়েই মুখ ব্যাদান করে রইলো কিছুক্ষণ। 'কি বানিয়েছো এসব? মোটেও টেষ্ট নেই।'

www.pathagar.com

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল তোর। শান্তভাবে এগিয়ে এসে বলেছিলি—'কেন কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে, বোঝার মতো ব্রেন আছে তোমার?'

তুই চুপ।

তোর বর যেন রাগে ফেটে পড়ে।

'রাবিশ! এসব খাওয়া যায়। স্টুপিডের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? নিয়ে যাও, এসব খাবো না আমি ।'

নীরবে তুই বাটি নিয়ে সরে এসেছিস্। দৈত্যের মতো আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছি—'কি মশায়! দৈ-চিড়ে মুখে রুচে না? পরোটা বানিয়ে আনতে বলবো? খাশীর গোস্ত আর পরোটা? কিন্তু ভাই, এ বাড়ীতে কিন্তু টয়লেট ইজারা পাওয়া যাবে না, বলে দিলাম।'

কিছুক্ষণ পর, তোর বর টয়লেটে ঢুকে যখন এক থেকে দেড় ঘন্টা টয়লেটের দরজা বন্ধ রাখলো তখন ছোট ভাই দুষ্টুমি করে পরপর ক'টি ঢিল ছুঁড়লেন টয়লেটের দরজায়। তোর বর ভেতর থেকে কাঁশি দিয়ে বোঝালো, এখন বেরুনোর উপায় নেই, তিনি মহা সমস্যার সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন। ছোট ভাইয়া মুখে হাত গোল করে ধরে চেঁচিয়ে বললো—'বালিশ পাঠিয়ে দেবো?'

কিছুক্ষণ পর সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়েছে তোর বর। ভাইয়া মুখ লুকিয়ে রেখেছে। তোর বর অন্য কারো সাথেই রাগ করতো না। যত ঝাল ঝাড়তো সবই তোর ওপর। ভাইয়াকে সে রাগ করেনি। বলেছে—'আমি' এটা আপনার কাছে অ্যাস্পেক্ট করিনি।'

ছোট ভাইয়া টয়লেটের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতে হেসে বলেছে—'আপনি এক। দেড় ঘন্টা পর্যন্ত টয়লেট এংগেজ রাখায় এদিকে এমন নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই দশ নম্বর সিগন্যাল শোনা যাচ্ছে।'

ছোট ভাইয়ার বলার ভঙ্গিতে তোর বর হাসতে হাসতে কাঁশতে শুরু করলো।

আমরা সবাই তাকে পছন্দ করতাম। সে-ও আমাদের সবাইকে পছন্দ করতো। তোর সাথেও মাঝে মাঝে ভালো থাকতো। কিন্তু যখনি তোর শরীর খারাপ থাকতো, কখনো মাথা ধরা, কখনো কান ব্যথা, কখনো কোমর ব্যথা, কখনো পেটে ব্যথা ইত্যাদি শুনলেই দেখতাম—তোর জন্য সে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতো।

আশ্চর্য! তোর অসুখ-বিসুখে তার ভাষা বদলে যেতো কেন? তার কি অসুখ-বিসুখ হতো না? তার তো শুনতাম আজ দাঁত ব্যথা, কাল গলা ব্যথা।

বলতো—'আমার টনসেলের ব্যথা, অপারেশন করা লাগবে। আমার পাইলস অপারেশন করতে হবে।'

গ্যাষ্টিকের ব্যথাও তো হতো। হামেশাই ক্যাঁ ক্যাঁ করতো আর তুই তার জন্য আদার ঝালে নুন আর হলুদ দিয়ে পেঁপে সেদ্ধ করে খেতে দিতি।

www.pathagar.com

তুই তাকে অনেক ভালোবাসতি, তাই না বুবু!

তুই কি জানিস্ বুবু, সে এখন কতো বদলে গেছে!

তুই কি জানিস্ সে এখন কতোটুকু সুখী?

আমি তা জানতে চাই না! আমার বুবু যার কাছে আদর পায়নি, অন্য কাউকে সে এখন সমাদর করে কিনা তা জানার আমার কি প্রয়োজন?

আমি শুধু জানতে চাই, তুই কেমন আছিস বুবু? তুই কি মনে রেখেছিস্ এখনো তোর অতীতকে?

আমি তো মনে রাখতে চাইনি!

তবু কেন মনে পড়ে!

সুখের দিন এলেও দুঃখের সময়গুলো যে মানসপটে বারবার ভেসে ওঠে, এ বুঝি তারই প্রমাণ!

ভাদ্রের ভরা মৌসুমে যে বালিকাটির বিয়ে হয়েছিল একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যবসায়ীর সাথে, সে কি জীবন ও যৌবন সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত ছিল!

কেন কেউ এ কথাটি ভেবে দেখেনি! তেরো বছরের মেয়েটিকে কি করে জুড়ে দিলো তিরিশ বছর বয়সের একজন গোঁয়ার লোকের সাথে!

বাড়ি ভরা মেহমান। মহা ধুমধামে বিয়ে হচ্ছে একত্রে দু'মেয়ের। দু'টো পাটিতে তাদের দু'জনকে বসানো হলো হলুদ শাড়ী পরিয়ে। হলুদ মেথী মেখে, হাতে মেহেদী লাগিয়ে ফুলে ফুলে সাজানো হলো তাদের। এরপর হাতাহাতি, গুতোগুতি, হলুদ মাখামাখি। উঠোনে পানি ফেলে কে কাকে আছাড় খাওয়াতে পারে, কাদা মাখাতে পারে সে পালা। সারা বাড়ি জুড়ে সারা বিকেল ধরে চললো এ হলুদের অনুষ্ঠান। পরদিন বিয়ে।

বরযাত্রী এলো! দু'দিক থেকে দু'টো বজরা নৌকো। সুটকেস ভর্তি শাড়ী-গয়না, সাজ-সরঞ্জাম। হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি!

সারি সারি খাশী জবাই হলো। ফিরনী-বিরিয়ানী হলো। ভাঁড়ে ভাঁড়ে দৈ এলো। খেয়ে লোকেরা হৈ-হৈ, রৈ-রৈ করে বিয়ে নামক বলিটা সম্পন্ন করলো।

পরদিন তোর বাসর ঘর থেকে হাসি হাসি লাজুক লাজুক চেহারা নিয়ে তুই বেরিয়ে এলি।

আর আমি!

আমার অবস্থা ছিল সিংহের খাবার সামনে পুষি বেড়ালের মতো! আমার দুর্ভাগ্য, আমার নৈরাশ্য, আমার হতাশা, আমার বেদনা সবাই অনুভব করেছে। আমার দুঃখ, আমার নীরব কান্না সবাইকে কাঁদিয়েছে। আমার প্রতি নির্যাতন, আমার প্রতি অত্যাচার-অনাচার ও অবিচার সবাই দেখেছে—কেউ টু-শব্দ করেনি। সব বুঝেও সবাই

www.pathagar.com

না বোঝার ভান করেছে। কারণ বংশ-মর্যাদা বলে একটা বিরাট জিনিস রয়েছে না! একটা তুচ্ছ মেয়ের জীবনের মূল্য কি আর এর চেয়ে বেশী কিছু! তাছাড়া আমাদের দেশের মায়েরা সাধারণতঃ মনে করেন–'কোনো রকমে একটা বাচ্চা হয়ে গেলেই হয়, সবঠিক হয়ে যাবে। সবই মানিয়ে নিবে বাচ্চা কোলে এলে।'

ওইসব মায়েদের সাথে আমি একমত নই।

বুবু, তুই কি আমার মতামতের সাথে আগের মতোই একমত! তুই তো সর্বদাই আমার পক্ষে নিয়ে কথা বলতি।

তোর কি আজো মনে পড়ে, নুরা নামের সেই বদমেজাজী লোকটার কথা? লোকটা কালো কুচকুচে ছিল। যখন কথা বলতো, মনে হতো যেন বোমা ফাটছে। লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেজুর গাছে হাঁড়ি পাতা ও সাত সকালে এসে খেজুর রসের হাঁড়ি নামানো এটাই ছিল তার শীতের দিনের জীবিকা নির্বাহের উপায়। সে যেতো আমাদের কাচারীর সামনে দিয়ে, যেতো সকাল বিকেলে। পেছনে ঝুলতো খুঁটির মতো একটা হুক—যা দড়ির সাথে তার কোমরে বাঁধা থাকতো।

আমরা ভোরে যেতাম হুজুরের কাছে পড়তে। রোজই দেখতাম কাচারীর সামনে দিয়ে নুরা যাচ্ছে। আমার মাথায় কোত্থেকে একদিন একটা শয়তানী বুদ্ধি চাপলো কে জানে। আমি আব্বার লোহার ছড়িটা এনে তার পেছনের হুকে ঝুলিয়ে দিলাম। ছড়িটা তার পায়ের সাথে লাগতেই সে পেছনে হাত দিয়ে হেসে তা ফিরিয়ে দিলো।

একটু জোক করে বললো–'কিগো জামাইর মা,আমারে জ্বালান ক্যান?'

নুরা একটু এগিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গিয়ে চুপিসারে আবার ছড়িটা তার পেছনে ঝুলিয়ে দিয়ে দু'বোন হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লাম। নুরা টের পেতেই আবার ছড়িটা নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে হাসলো। বললো–'কি গো হ'রীরা, আপনেরা আমার পিছে লাগলেন ক্যান?'

নুরা হেটে যাচ্ছিল। তুই বারন করেছিস, আমি শুনিনি। আবার নুরার পেছনের হুকে ছড়িটা ঝুলিয়ে দিতে এবার সে কিছু না বলে ছড়িটি ফেলে দিলো শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসের ওপর।

আমরা তো হেসে কুটিকুটি। কুড়িয়ে নিলাম ছড়িটি। এবার বেশ সতর্কতার সাথে তার পিছু পিছু আস্তে আস্তে হেঁটে আবার তার পেছনের ঝোলানো হুকে ঝুলিয়ে দিলাম ছড়িটা। ঝুলিয়ে দিয়েই হেসে লুটোপুটি।

এবার নুরা ছড়ি আর ফিরিয়ে দিল না, ঝাড়া মেরে ঘাসের ওপরও ফেলে দিলো না। এবার রাগে কড়মড় করে ছড়িটা হাতে নিয়েই ঘুরাতে ঘুরাতে এতো জোরে দূরে ছুঁড়ে মারলো যে, ভারী লোহার ছড়ি 'শা' করে উড়ে গিয়ে পড়ল একদম মসজিদের পুকুরের মধ্যখানে।

আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। হনহন করে চলে গেলো নুরা।

প্রথম মুখ খুলেছিস তুই!

www.pathagar.com

'এবার কি হবে! বারবার নিষেধ করিনি? আব্বাতো একটু পরেই ছড়ি চাইবেন, তখন কি হবে?'

আমার মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে।

'আরো গুতোগুতি কর নুরার পেছনে গিয়ে!'

'আর করবো না বুবু! নুরাকে বল্ না ওটা তুলে দিতে।'

'পাগল নাকি! নুরা যা ক্ষেপেছে।'

আমাদের কাজ করতো আবুল ঢালী। আমরা তাকে 'আবুল কাকু' বলে ডাকতাম। আবুল কাকু আমাদের খুব আদর করতো।

সব শুনে আবুল কাকু বললো—'আমি এক্ষুনি ডুব দিয়ে তুলে আনছি ওটা। কিন্তু আমাকে বলতে হবে ঠিক কোন্ জায়গায় সে ছড়িটা ছুড়ে ফেলেছে।'

আমরা দেখিয়ে দিলাম। ঠিক সে জায়গায় একাধিক ডুব মেরেও ছড়িটা পাওয়া গেলো না। ছোট ভাইয়া এসে দেখলেন, আবুল কাকু ডুব দিচ্ছে আর বলছে–'কই এখানে তো ছড়িটা নেই।'

ডুবিয়ে ডুবিয়ে শেষতক ছড়িটা পাওয়া গেল। ভাইয়া জিজ্ঞেস করলেন–'এটা ওখানে গেল কি করে আবুল কাকু?'

আবুল কাকু শীতে কাঁপছিল। গামছা দিয়ে শরীর-মাথা মুছতে মুছতে বলল–'নুরা ছুঁড়ে ফেলেছে।' বলে আমাদের দিকে তাকালো।

ছোট ভাইয়া ব্যাপারটা বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল।

'আব্বার ছড়ি নুরার হাতে গেলো কি করে?'

আমরা চুপ। আবুল কাকু কাঁপছে শীতে। হাসছে নীরবে-নিঃশব্দে। ভাইয়া তাকালো আমার দিকে।

'এই স-ব তোমার শয়তানী তাই না? আমি এক্ষুনি গিয়ে ছোট মাকে সব বলে দিচ্ছি।'

ছোট মা মানে আমার মা, যাকে বলা যায় রয়্যাল বেঙ্গল বাঘিনী! যমের নামেও হয়তোবা এতো ভয় পেতাম না।

'না, ভাইয়া, ও তো ছড়িটা ধরেওনি। আমি হাস্নাহেনার ডালটা নাগাল পাচ্ছিলাম না, তাই ছড়িটা এনেছিলাম। ওর কোনো দোষ নেই।'

তুই সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছিস।

ভাইয়া তোকে ধমকে বলেছিল–'তুমি বাট্কু শয়তান, তোমার সাহস তো কম নয়—আমার হাস্নাহেনা গাছে হাত দাও? সাবধান! আমার বাগানে যদি আবার ঢুকেছো! একটা বেলী ফুল ছিঁড়লে তোমার কান আমি ছিঁড়ে দেবো।'

কাচারী ঘরের সামনের বারান্দার পাশেই ছিল ভাইয়ার বাগান। বাগানে টগর, জবা,

www.pathagar.com

সন্ধ্যা মালতী, বেলী, গাঁদা, হাস্নাহেনা ছাড়াও আরো নানান রকম ফুলের গাছ লাগিয়েছিল ভাইয়া। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সুন্দর করে বানানো বাগানের গেটের ওপর লতানো ছিল মাধবী লতা আর গেটের দু'পাশে গজিয়ে উঠেছিল মানিপ্লান্ট।

ভাইয়ার কড়া নিষেধ, কেউ তার বাগানে ঢুকবে না, গাছে হাত দেবে না, ফুল ছেঁড়ার তো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

ভাইয়ার ভীষণ বকুনী খেতে হবে, হয়তোবা তক্ষুনি কষে দু'টো চড়ও লাগিয়ে দেবে, অথবা চুলও টেনে ধরতে পারে। এসব তোর জানা ছিল। কিন্তু তারপরও আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুই এতোবড় সাহস করেছিস্। তোর কি কোনো তুলনা ছিল! না আছে?

বুবু, আসলে কি তুই আমার সৎ বোন?

আমি বিশ্বাস করি না, মোটেই না।

বিয়ের পর প্রথম দিকে তোকে অত্যন্ত সুখী মনে হয়েছিল। এমনকি বিয়ের দিনেও নাকি তুই খুব উৎফুল্ল ছিলি। আমার একটা আফসোস ছিল, এখনো আছে। তোর বিয়েতে আমি আনন্দ করতে পারিনি। বিয়ের রাতে কতো মজা করে শালীরা। নুন দিয়ে শরবত বানিয়ে দুলাভাইকে খেতে দেয়। নতুন বৌয়ের সাথে তিন/চারটা ছেলে-মেয়েকে বউয়ের মতো সাজিয়ে ঘোমটা টেনে বসিয়ে রাখা হয়। বর ঠিকঠাক মতো বউয়ের পাশে বসতে পারলে বাকী সবাই উঠে দৌঁড়ে পালায়, আর ভুল করলে যার পাশে বসবে তাকে টাকা দিয়ে বিদেয় করতে হয়।

তোর বর তো ভীষণ চালাক। তাকে ঠকাবে কে? ঠিকই তোকে চিনতে পেরেছে, তোর পাশে বসতেই সবাই উঠে পালিয়েছে, কিন্তু একজন আর যায় না। যতই ধাক্কা মেরে সরায় আরো কাছে এসে ঘেঁষে বসে। শেষতক কোলেই উঠে বসলো। টাকা না দেয়া পর্যন্ত নাকি ছোট ভাইয়া তোর বরের কোল থেকে নামেনি। টাকা পেতেই প্রথমে ঘোমটার তলা থেকে ব্লাউজ খুলে দুলাভাই'র হাতে ছুঁড়ে দেয়।

'এ কি হচ্ছে!' তোর বর ঘনঘন নিঃশ্বাস নেয়, ঢোক গিলে।

কতক্ষণ পর পুরো শাড়ীখানাই খুলে বরের হাতে দিয়ে 'শুভ রাত্রি' বলে পালিয়ে যায় ছোট ভাইয়া।

আমি কি আনন্দে শরীক হতে পারতাম না বুবু!

আমার কি হাসি-গান, আনন্দ করার সাধ ছিল না?

ছিল! সাধ অবশ্যই ছিল। সাধ্য ছিল না। কারণ আমি যে তখন গয়নার ভারে নুয়ে পড়া লতার মতো শরীরটাতে বেনারসী পেঁচিয়ে তার লম্বা ঘোমটার নিচে প্রচন্ড গরমের সাথে লড়াই করে যাচ্ছিলাম।

অথচ আমার কতো ইচ্ছে ছিল– তোর বিয়েতে নাচবো, গাইবো, আনন্দ করবো। তুই ছিলি আমার ছোট বেলার সংগী, আমার লেখা-পড়া, হাসি-গান, আনন্দের সংগী।

আমি ডবল প্রমোশন পেয়ে ক্লাস থ্রীতে যখন তোকে লাফিয়ে ধরে ফেললাম সেই

www.pathagar.com

থেকে তোর কি খুশী!

আমার খাতা থেকে নোট নেয়া, আমার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর জেনে নেয়া—তোর যে কি আনন্দ ছিল তাতে!

তোর কি মনে পড়ে, খোকা ভাইয়ের আব্বার কথা? যার হাতের লেখা ছিল মুক্তার মতো। আমরা 'কপি' করতে চাইতাম তাঁর হস্তাক্ষর।

মনে পড়ে কি যশোরের সেই পন্ডিত সাহেবের কথা? যিনি সর্দি লাগলেই বলতেন—'চিলুমচিটা নিয়ে আয়তো বাপু, নাকটা ঝেড়ে নিই।'

বুবুর মেঝো ছেলে আলমগীরকে ওই পন্ডিত সাহেব কারণে-অকারণে খুব মারতেন। আমরা এজন্য তাকে মোটেও পছন্দ করতাম না।

একবার পন্ডিত সাহেব চিলুমচি চাইলেন, আলমগীর তা পায়ে ঠেলে তাঁর সামনে এগিয়ে দিলে তিনি তো রেগে আগুন। রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে চেঁচিয়ে ডাকলেন ফাতেমাকে, 'এই ফাতু! লাঠিটা নিয়ে আয় তো, ছোড়াটাকে এট্টুসখানি পিটিয়ে দিতে হয়।'

দাদার মেয়ে ফাতেমা পণ্ডিত সাহেবের দিকে লাঠি এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—'পন্ডিত সাব হুজুর! নাকটা আগে ঝেড়ে নেন। নইলে

চায়ে আর দুধ দিতে হবে না।'

বেচারী ফাতুও দু'ঘা খেয়েছিল সেদিন!

বিলেতের এই চাকচিক্যময় জৌলুসভরা পরিবেশে বসে আজো আমি তা ভাবি। সবুজে-শ্যামলে জড়ানো গাঁয়ের সেই ফেলে আসা স্মৃতি আজো আমাকে কাঁদায়।

তোরও কি তাই হয় বুবু?

রুহুল আমীন মাষ্টার যখন গান শেখাতেন, এক দু'বার শুনলেই আমি মনে রাখতে পারতাম। আমি অনায়াসে গেয়ে যেতাম-

'খাইবার দ্বারে তার পতাকাবাহী
মেঘনা কুলের যতো বীর সিপাহী
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন গাহী
দুনিয়া করে যে আবাদ .....'

স্যার বলতেন-'সাবাস!'

কিন্তু তোর উচ্চারণে প্রায়ই ভুল হয়ে যেতো। তুই গাইলে তা হতো এরকম—'পাচ্য-পতীচ্যের মিলন গাহী।'

স্যার বলতেন—'পাচ্য নয়-প্রাচ্য, একট র-ফলা দিয়ে বলো।'

তুই বলতি—'পাচ্য-পতীচ্যের মিলন।'

www.pathagar.com

স্যার শান্ত কণ্ঠে আবার বলতেন—'আরে পাগল, র-ফলা ?'

'বললাম তো প্রাচ্য।'

'হ্যাঁ, প্রাচ্য বলেছ, প্রতীচ্য বলনি, বলেছ পতিচ্চ।'

'এ্যাঁ, দুইটাতে দুইটা রফলা!'

তোর কথা শুনে স্যার হেসে বলেছেন–'কেন, দুইটাতে দুইটা র-ফলা দিতে তোমার কোনো আপত্তি আছে!'

স্যারের কথায় তুইও হেসেছিলি।

আমরা যে ষড়ঋতুর গান গাইতাম তা কি তোর মনে আছে? আমার কেন জানি একটাও মনে নেই। আমার তো শীতের পার্ট ছিল। আশ্চর্য! ওটাও মনে নেই। একটুখানি মনে আছে, দিলু যে বসন্তের পার্টে গেয়ে উঠতো—

'বসন্তে আজি চাঁদ চকোরী

পাগল শুধু হামিয়া...'

আমার কিন্তু জারী গানের কথাগুলো এখনো মনে আছে। সেই যে গাইতাম–

'ষোলোই তারিখ অক্টোবর

ছিল সেদিন মঙ্গলবার

রাওয়ালপিণ্ডি জনসভাতে গেল রে।

বেলা তিনটায় গুলী করে

চারটা চল্লিশেতে মরে

সৈয়দ আকবর গুলী কইরা ছিল রে!।

দিন গেলো,

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহা মুখে বলো....'

মাষ্টার সাহেব আরো কতো গান শেখাতেন। সবই আজ ভুলে গেছি। কোনোটাই পুরোপুরি মনে নেই। কি কঠিন কঠিন শব্দের গান সব—

'তারা সে ইশারা নব সাম্যবাদের

প্রতীক সে অগণিত গণ মানবের।'

আজ কোথায় সেই ইউনুস ভাই!

আমাদের প্যারেড শেখাতেন তিনি।

আমার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে সেই ড্রামার কথা। ইউনুস ভাই আর রুহুল আমীন মাষ্টার মিলে এই নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন। এটি ছিল নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে একটি ছোট নাটক। নাটকটি সেট করা হয়েছিল এরকম ভাবে যে—

'এক জায়গায় একটি জনসভা হচ্ছে। জনসভায় ফুলে ফুলে ফুলদানীতে সাজানো টেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন সভানেত্রী। কিছু বক্তা আর স্টেজভর্তি শ্রোতা ও শ্রোতাদের সাথে আছে কালির মা।'

এ নাটকে আমাকে দেয়া হলো সেই 'কালীর মা' নামে অশিক্ষিতা, গেঁয়ো, আনাড়ী বুড়ীর পার্ট। আমি ছেঁড়া-ফাঁড়া একখানা পুরোনো শাড়ী পড়ে স্টেজের এককোনে ডজনখানেক লোকের সাথে বসে থাকবো। এরপর উঠে কুঁজো হয়ে হাঁপিয়ে-কেঁকিয়ে আসবো স্টেজের মাঝখানে, বসে, আঁচলের খুঁট থেকে পান বের করে মুখে ঠেলতে ঠেলতে বলবো—'হায় হায়! কি কমু মা! দেশে এক রহম মানুষ লামছে, হেরা কয়, মাইয়াগোরে লেহান-পড়ান বালা। আবার কেউ কয়, লেহা-পড়া এককারে দরকার নাই। হেদিনকা আংগ গেরামের বাশ্শার বাপে কয়, কিগো কালির মা, তোর মাইয়ারা দেহি তাল গাছের লাহান লাম্বা অইছে। ইসকুলে যায় ক্যান? এতো লেহাইয়া-পড়াইয়া মাইয়াগুলারে কি উহিল-মোক্তার বানাবিনি? বালিস্টার বানাবিনি?'

আমার এইসব কথার মাঝখানে টেবিলে থাপ্পর মারার আওয়াজ আসবে।

রোলটা দেয়া হলো দিলুকে। স্টেজে সে বসে থাকবে চেয়ারে। তার সামনে থাকবে টেবিল। সে এখানে সভানেত্রী।

কালিব মা'র কথার মাঝখানে টেবিলে থাপ্পর মেরে দিলু উঠে দাঁড়াবে—'শোনো কালির মা! লেখা-পড়া ছাড়া মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। শিক্ষা জাতির সম্পদ। যে জাতি শিক্ষাকে অবহেলা করে তারা কোনোদিন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করতে পারে না। আমাদের নবী বলেছেন–'শিক্ষা অর্জন কর, জ্ঞান আহরন কর, যদি তোমাকে এর জন্য সুদূর চীনেও যেতে হয়।'

দু'দিন রিহার্সেলের পর বেঁকে বসলাম আমি।

'স্যার, আমি কালির মা হবো না! কালির মায়ের ভূমিকা ছাড়া আমাকে আর কিছু দেয়া যায় না?'

স্যার মাথা সোজা করে দাঁড়ালেন—'কালিল মা হতে চাও না, কি হতে চাও?'

'আমি সভানেত্রীর পার্ট চাই। দিলুর ওই পার্টটা আমি চাই। আমি চেয়ারে বসে দিলুর মতো টেবিলে থাপ্পর মেরে কথা বলবো।'

স্যারের আওয়াজ নরম হয়ে এলো। হেসে বললেন—'তুমি কি জানো? তোমাকে যে পার্টটা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই নাটকের প্রধান, কালির মা হচ্ছে এই ড্রামার মূল্য চরিত্র। দিলু চেয়ারে বসবে, দিলু সভানেত্রী হবে তা ঠিক; কিন্তু এ নাটকের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে কালির মা।'

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম—'তা হোক, কালির মা'র রোলটা দিলুকে দেয়া হোক-আর আমি হই সভানেত্রী।'

স্যার আমাকে খুব আদর করতেন। সুন্দর করে বললেন—'দিলু ওটা তোমার মতো

www.pathagar.com

করতেই পারবে না। যে ভঙ্গিতে তুমি কুঁজো হয়ে শ্রোতাদের মাঝখান থেকে উঠে এসে গালে হাত দিয়ে বসে আঁচলের গিঠ থেকে খুলে পান মুখে ঢোকাও এবং অশুদ্ধ কথাগুলো যেভাবে সঠিক উচ্চারণ করতে পারো এটা আর কেউ পারে না। তাছাড়া এগুলো বলতে গিয়ে ওরা নিজেরাই হেসে ফেলে।'

খেঁকিয়ে উঠলেন ইউনুস ভাই। 'এ্যাইঁ! তুই আবার সভানেত্রী হবি কিরে? তোকে যা দিয়েছি তাই করবি। এ যেন দাদার হাতের কলা আর কি, বেছে বেছে নেবো। অতো চয়েস কাউকে দেয়া হবে না।'

আমি কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে চাইলে তিনি এক ধমকে বসিয়ে দিলেন-'খবরদার! কথা বলেছিস আবার!'

ইউনুস ভাই খুব রাগী ছিলেন। ভীষণ ভয় করতাম তাকে। দ্বিতীয় বার কথা বলতে সাহস পাইনি, তবে ড্রামার রিহার্সেলে আমি হাজিরও হইনি।

কালির মা'র ভূমিকায় নেয়া হলো তোকে। তুই কি পার্ট করবি, হাসির ঠেলায় তোর মুখ দিয়ে কথাই আসে না! বুড়ী মানুষের ভঙ্গিও হয় না, সে ভঙ্গিতে কথাগুলোও হয় না।

আবার আমার ডাক পড়লো। খোঁজাখুজি শুরু হয়ে গেলো। আম্মা বললেন-'বাদ দাও ওকে, করতে চায় না যখন।'

ইউনুস ভাই মিনতি করলেন-'ওকে ছাড়া চলবে না চাচী আম্মা। কালির মা'র রোল ওর মতো কেউ করতে পারে না ওর এ্যাকটিং, ওর ডায়ালগ বলার স্টাইল পারফেক্ট।'

রুহুল আমীন স্যার বোঝালেন আমাকে। সুন্দর করে বোঝালেন—'দ্যাখো, এ নাটকে কালির মা-ই হচ্ছে আসল। চেয়ারে কে বসেছে সেটা কোনো বিষয় নয়—'রোলটা কতখানি গুরুত্ব রাখে সেটাই হচ্ছে বিষয়। তুমি বুঝতে পারছো না যে, কালির মার কতো দাম এখানে। কালির মা এ নাটকে না থাকলে এটা কোনো আকর্ষণীয় নাটকই হতো না।'

ইউনুস ভাই ভেংচিয়ে বললেন—'সভানেত্রী হবে, যত্তোসব ননসেন্স আইডিয়া। বুঝতে পারছে না যে, নাটকের সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট রোলটাই তাকে দেয়া হয়েছে। ইডিয়েট কোথাকার!'

নির্ধারিত সময়ে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য পিতৃদত্ত নামটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম 'কালির মা' নামে।

মনে পড়ে কি তোর মহিবুল ভাইয়ের কথা?

মহিবুল ভাই হ্যান্ডসাম, নওজোয়ান, সম্পর্কে শুধু চাচাতো ভাই নয়—খালাতো ভাইও। তার আব্বা আমার আব্বার চাচার ছেলে। তার আম্মা আমার আম্মার মামার

www.pathagar.com

মেয়ে। তিনি কোনোদিন আমার আম্মাকে চাচী ডাকতেন না, খালা বলে ডাকতেন। আমরাও তাঁর আম্মাকে খালা ডাকতাম।

খালা আর আম্মা একই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। খালা ছিলেন খুবই সুন্দরী। সব সময় সাদা শাড়ী পরে স্কুলে আসতেন। খালা ও আম্মার চোখের চশমা ও মাথার ঘোমটার দিকে আমি সবসময় তাকাতাম আর বইয়ে বেগম রোকেয়ার ছবির সাথে মিলিয়ে দেখতাম। আমার খুব ভালো লাগতো।

খালার ছেলে দু'টোই দেখতে তাকিয়ে থাকার মতো ছিল। মুনু ভাই দেশে-গাঁয়ে বেশী থাকতেন না। পড়াশুনা নিয়ে বাইরে বাইরে থাকতেন। মহিবুল ভাই ঘুরঘুর করে বেড়াতেন গাঁয়ের মেঠোপথে, নদীর ধারে, সুপুরীর বাগানে, স্কুলের আনাচে-কানাচে, আর গুনগুন করে গান গাইতেন—

'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা,
আমাদের-ই বসুন্দরা,'...

মাঝে মাঝে স্কুলে বসে মহিবুল ভাই গলা ছেড়ে গান ধরতেন। গলার দু'পাশ ফুলে উঠতো তার। চোখ বন্ধ করে সুরে টান দিতেন—

'খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব দুলালী নবী নন্দিনী... ।'

দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনেই মহিবুল ভাইয়ের বিয়ে হলো। বউ নয়, যেন ফুলপরী। যেমনি ফর্সা তেমনি দীর্ঘাঙ্গী।

বিয়ের পর মহিবুল ভাইকে আর দেখাই যেতো না। তিনি দোতলা থেকে নামতেনই না। তাই বলে ভাই-বন্ধুরা তো আর ছাড়বার পাত্র নয়। ডাকতে ডাকতে উঠোনে এসে যেতো- 'কিরে মহিবুল, ঘরকুনো ব্যাঙের মতো আর কতোদিন বউয়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকবি? আরে ব্যাটা!বেরো এরপর তো সূর্যের আলো দেখলেই ভয় পাবি তুই!'

মহিবুল ভাইয়ের আগেই বউ বেরিয়ে এসে দাঁড়াতো দোতলার ব্যালকনীতে। ভীষণ সাহসী মেয়ে ছিল সে। বলতো—'দাঁড়ান আপনারা, ও আসছে।'

'ওরে বাবা! এতো বাঙালী মেয়ে নয়। এ যেন পাঞ্জাবী মেয়ে।'

দ্বিধায় হোক আর লজ্জায় হোক, ওরা পালিয়ে যেতো উঠোন ছেড়ে। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বেরিয়ে আসতেন মহিবুল ভাই।

সকলের মুখে মুখে একই কথা-'বউ পেয়ে মহিবুল পাগল হয়ে গেছে। বউয়ের গোলাম হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

ভাবীরা ঠাট্টা করে—'কিরে, মহিবুল তো মনে হচ্ছে দোতলায় ডিমে তা দিতে বসেছে। শেষে তো ইঁদুর-বেড়াল দেখলেও ভয় পাবে। মাঝে মাঝে একটু বের হতে দিস তোর আঁচলের গিঠ খুলে।'

মহিবুল ভাই'র বউয়ের জবাব ছিল স্পষ্ট। যা বলার সবার সামনেই ফটাফট বলে দিতো- 'তা এর উল্টোও তো হতে পারে।'

'উল্টো আর কি হবে?' ভাবীদের টিপপুনী।

'হতে পারে সে আমার আঁচলের গিঠে নয় বরং আমাকেই সে তার শালের তলায় চেপে রাখে। কিন্তু এটা তো দোষের কথা হতে পারে না। আর যদি দোষের হয়ে থাকে সে দোষ আপনাদের ছেলের, দোষটা বউয়ের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন? তাছাড়া সে তো আমার দেবর-ভাসুর নয়, সে তো আমার স্বামী।'

'অ মা! আর বুঝি বাড়িতে কারো স্বামী নেই!'

'থাকলে তারাও বউয়ের গোলাম হোক, যেমন বউয়েরা তাদের দাসী। আমার যদি দাসী হতে আপত্তি না থাকে তাহলে তার গোলাম হতে অনীহা থাকবে কেন! আর কেনইবা লোকেরা তা ভালো নজরে দেখবে না!'

মহিবুল ভাই'র বউয়ের কথা শুনে সবাই তাজ্জব বনে গেছে। কারো মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। আজব কথা! আজতক শুনেছে কেউ এসব কথা?

কেউ বলেছে, বেশরম!

কেউ কেউ ঠোঁট উল্টিয়ে বলেছে—'ভালো কথা আর কি কইবো? হায়া শরম নাই। চউরা মাইয়াগো কথার টেক্‌সো আছে নাকি!'

'চউরা মেয়ে' মানে নদীর পাড়ে যাদের বাড়ি অথবা নদী শুকিয়ে গজিয়ে ওঠা চরে যাদের বসত বাড়ি।

খালা তার পুত্রবধূকে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। বলতেন-'তোমরা কেউ বাজে কথা বলো না। আমি তো মনে করি বউয়ের হিম্মত আছে। কথা বলার সাহস রাখে সে।'

এরপর একদিন সাত সকালে কান্নার রোল শোনা গেলো দোতলায়। খুব ভোরে খালা উঠেছিলেন ফজরের নামায পড়তে। সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাস্থবান খালা, অজু সেরে জায়নামাযে ডান পা রাখলেন, বাঁ পা তুলবার আগেই ঢলে পড়লেল কাত হয়ে। হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে এলো ঘরের সবাই। কিন্তু দেখা গেলো, খালা এখান থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।

মহিবুল ভাই'র অনেক কষ্ট হয়েছিল ফুলের মতো সুন্দর মায়ের দেহখানি মাটির তলায় ঢেকে দিতে।

www.pathagar.com

মা মারা যাবার পর মহিবুল ভাইদের সংসারে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে থাকে। তার বউয়ের রূপ-গুণ আর কড়া কড়া কথাবার্তা অনেকেরই ভালো লাগেনি। লোকেরা বউয়ের নানান দোষ বের করতে শুরু করলো।

কি থেকে কি হলো, কি নিয়ে তর্ক, কথা কাটাকাটি, মাথায় রাগ চড়ে গেলো মহিবুল ভাই'র। একসঙ্গে 'তিন তালাক' বলেই দোতলায় গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন একদিন।

আশ্চর্য! বউ একটুও কাঁদলো না, রাগ করলো না, হাত দিয়ে তুলে নিলো না এ সংসার থেকে একটি জিনিসও। দু'টো ছেলে আর একটি মেয়ে ফেলে সোজা ভাই'র সাথে চলে গেলো বালুচরে—তার বাবার বাড়ি।

বুঝিয়ে সুজিয়ে লোকেরা মহিবুল ভাইকে চাঙ্গা করে তুলেছে; কিন্তু বউকে ভুলতে পারেনি সহজে। যেদিক গিয়েছে গান ধরেছে-

'কোথা চাঁদ আমার!

ভূবণ ভরিয়া মোর ঘিরিল আঁধার... ।'

বালুচরে বারবার গিয়েছে, লোক পাঠিয়েছে, কিন্তু বউয়ের মন নরম করতে পারেনি। বাচ্চাদের পরিণতির কথা ভেবে যেন বিষয়টি বিবেচনা করে-এ বলে বহুবার মেয়ে-মানুষও পাঠিয়েছে বালুচরে।

কিন্তু বউয়ের একই কথা-'একসঙ্গে তিন তালাক দিলো কেন? এক তালাক দিলো তো তার কাছে ফিরে যাবার একটা পথ থাকতো আমার।'

ভাই-ভাবীরা বুঝিয়েছে-'অন্যায় কিছু না করলে কি আর তালাক দিয়েছে! নিশ্চয়ই অনেক দোষ ছিল তোর। হঠাৎ করে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, তালাক দিয়ে ফেলেছে।'

মহিবুল ভাই'র বউয়ের কণ্ঠস্বর কঠিন।

'কোথাও তালাক-ফালাক হলে তোমরা ধরেই নাও যে, দোষ বউয়ের ছিল। তোমরা কি মনে করো যে দুনিয়ার সব পুরুষগুলো ফেরেস্তা? সংসারে পুরুষগুলোর কি কোনো দোষই নেই! দোষ তাদের নেই? অন্যায় স্বামীরা করে না? দুনিয়ার ক'টা বউ স্বামীকে তালাক দিয়ে এভাবে শাস্তি দেয়!'

বড়োরা এরপরও বোঝাতে চেষ্টা করেন—'বাপের বাড়ির মাটি দু'দিন হাঁটলেই কাদা হয়, কিন্তু স্বামীর বাড়ির মাটি পায়ের ঘষায় ঘষায় সোনা হয়। বেচারা যখন এতো করে তুই ফিরে যা।'

'কেন যাবো? যার হৃদয়ে আমার জায়গা নেই তার ঘরে জায়গা নিয়ে কি লাভ? আল্লাহর দুনিয়া কি এতো ছোটো? বালুচরে জায়গা নেই! বাবার সম্পত্তিতে আমার কি অধিকার নেই?'

www.pathagar.com

'তোর বাচ্চাদের কি হবে?' বড়োদের প্রশ্ন।

'আমি মরে গেলেও যা হতো তাই হবে। এখন আমার ছেলে-মেয়েরা যখন ইচ্ছা আমার কাছে আসবে। তাদের জন্য যা পারি, আমি এখানে থেকেই করবো। সে গ্রামে আমি আবার ফিরে যাবো। ছেলেরা বাড়ি বানাবে, আমি তাদের মা হিসেবে ফিরে যাবো। গাঁয়ের মানুষ বুঝবে, পুরুষেরই শুধু ঘেন্না নেই, মেয়েদেরও আছে। পুরুষদেরই শুধু দাপট নয়, দাপট মেয়েদেরও আছে। সব সময় পুরুষরা যা ইচ্ছে তা করবে আর মেয়েরা নীরবে তা সয়ে বেড়াবে এটা তো জরুরী নয়।'

বুবু, এরপরের ঘটনা কি তুই জানিস্?

শুনলে অবাক হবি গত বছর দেশের বাড়িতে গিয়ে দেখি মহিবুল ভাই'র বউ! বড় আম্মার খাটের ওপর বসে আছেন। হেসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

'তোমাকে দেখতে এসেছি। শুনলাম লন্ডনে থাকো এখন। ভেবেছিলাম কতো না জানি মোটা হয়েছো।'

'কেন, মোটা হইনি?' এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখালাম।

'কই মোটা হয়েছো? যেমনটি ছিলে তেমনিই তো আছো। আমি তো বাংলাদেশের সীম-পটল খেয়েও তোমার চেয়ে অনেক মোটা আছি।'

'না ভাবী আপনি বেশী বদলান্নি!'

আসলেই ঠিক। আগের মতোই ফর্সা। হাসি হাসি মুখ, সামান্য বয়সের ভারিক্কী এসেছে চেহারায়। মোটা কিছুটা হয়েছেন, তবে লম্বার কারণে মোটেই খারাপ লাগছে না।

জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে মানুষ সব জায়গাই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাবার সংসারে এই ভাবী কোনোদিনই অবাঞ্ছিত-অপাংক্তেয় ছিল না। সবাই তাকে ভালোবাসতো। ছেলে বড় হয়ে কেউ চাকুরীতে, কেউ ব্যবসায় বেশ ভালো করলো। বড় রাস্তার পাশে জমি কিনে বাড়ি বানালো। মাকে যখন নিয়ে আসতে চাইলো বালুচরের লোকেরা কেউ আসতে দিতে চায়নি তাকে।

ছেলেরাও বুঝতে পেরেছে, যার জ্ঞান আছে, গুণ আছে তার কদর তো সর্বত্রই থাকবে। তারা জোর করে নিয়ে এসেছে মাকে নিজেদের কাছে।

ঠিকই এ গ্রামে ফিরে এসেছেন তিনি একজন 'গর্বিতা মা' হিসেবে। বাবা -ভাইয়েরা যে তাকে বিয়ে দিতে চায়নি তা নয়। তিনি কঠোর কণ্ঠে লড়াই করেছেন সকলের সাথে। বলেছেন- 'আমার বিয়ে দেবেন? কার সাথে দেবেন? আমার যেহেতু একবার বিয়ে হয়েছে এখন তো আপনারা আমার জন্য খুঁজতে থাকবেন কোথায় কোন্ বুড়োর বউ মরেছে এমন লোক। দাঁত পড়ে গেছে, চুল পেকে টাক হয়েছে, রোগা, আধা মরা,

www.pathagar.com

কুঁজো, বুড়ো ছাড়া কে আসবে আমাকে বিয়ে করতে! এরপরও সে মনে করবে, এক তালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে বিয়ে করে সে এক মহান ত্যাগ স্বীকার করে ফেলেছে। সে খোঁটা আমাকে উঠতে-বসতে শুনতে হবে। তার চেয়ে আমি এমনি থাকাই ভালো মনে করি। বাবার ছেলে হলে কি বাড়ি থাকতাম না!'

বুবু তোকে এতো লম্বা গল্পটি মনে করিয়ে দিলাম কি জন্য জানিস? রাগ করিস নে, আমায় ভুল বুঝিসনে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তুই কি পারতি না মহিবুল ভাই'র বউয়ের মতো হতে? তার দেমাগ, তার সাহস, তার তর্ক, তার মতামত, তার আত্মসম্মানবোধ-এর কোন্‌টা তোর কাছে মনে হয় বাড়াবাড়ি, মনে হয় অন্যায়?

মহিবুল ভাই তো আবার বিয়ে করেছেন, বিয়ে করেছেন তার চেয়ে বিশ বছরের ছোট একটি নাবালিকা মেয়েকে। তুই কি মনে করিস্‌, মহিবুল ভাই খুব সুখে আছেন।

বুবু, তুই আমাকে ক্ষমা করিস্‌। সত্যি কথা হচ্ছে, মহিবুল ভাই'র বউয়ের যে সাহস, যে আত্মসম্মানবোধ ছিল তা তোর ছিল না। নইলে কি করে মাথা পেতে নিতি সব দোষ, কি করে সহ্য করেছিস্‌ এ অবিচার, এ বৈষম্য?

অনেক কথাই তুই মুখ দিয়ে বলিসনি। আমরা তোর চোখের দিকে তাকিয়ে, তোর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

তোর প্রতি তোর বরের অন্যায় আচরণ, অযথা হাঁকডাক আমার মোটেই ভালো লাগতো না। আমাদের সাথে এতো ভালো ব্যবহার করতো, এতো হাসি-আমোদ করতো, অথচ কেন যে তোর সাথে মিছেমিছি রাগারাগি করতো। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কথা বলতো তা জানি না।

জানিনে বলছি এ জন্য যে, তোর কাছ থেকে কোনোদিন কোনো কথা বের করতে পারিনি। তুই বরং আফসোস করে বলেছিস্‌—'আমারই দোষ। আমার মধ্যে অনেক জিনিস নেই-যা আমার থাকা দরকার ছিল।'

আমি রাগ করতাম-'মিথ্যে কথা! তুই কমপ্লেক্সে ভুগিস। তোর বরেরও অনেক খুঁত আছে। সে-ও স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। মুখ ভরা ব্রন। হাজার রোগের সমন্বয়ে এক তালপাতার সেপাই। শুধু কি তাই, তোর বর একটা ভন্ড।'

'ছিঃ! বাজে কথা বলিস কেন্‌? সে কোনো ভন্ডামি করেনি।'

'করেনি মানে! বিয়ের আগে আব্বা তাকে যখন দেখতে গেছেন তখন রীতিমত টুপি মাথায় চেপে মসজিদে পাঁচ বেলা নামায পড়ে আব্বাকে 'খুশী' করে দিয়েছেন। আর এখন? এখন নামায তো দূরের কথা পশ্চিম দিকে ফিরে আছাড়ও খায় না। কি ধার্মিক! যাকে বলে একেবারে বক ধার্মিক।'

www.pathagar.com

'আরে না না, আব্বাকে খুশী করার জন্য নয়, সে তো তখন এমনিতেই নামায পড়তো। পরীক্ষা সামনে ছিল তো!'

'তাই বুঝি!'

'পরীক্ষায় পাশ করার জন্যই তো তখন নামায পড়েছে খুব। ক'দিন ধরে নাকি কোরান শরীফও পড়েছিল। তাতেও বেচারার কপাল খারাপ, থার্ড ডিভিশন এসেছে নামের সাথে।'

'মনে কর এটুকই তার সৌভাগ্য ছিল। নামায না পড়লে ডিভিশন তো দূরে থাক, হয়তোবা পাশই করতো না।'

আমার সাথে তর্কে না পেরে তুই চুপ করে থাকতি। তোর কি মনে পড়ে, তোর শ্বশুর বাড়ির সব লোকগুলোর কথা? কি ভালোই না ছিল সবাই। সবাই তোকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। তোর শ্বশুর তো প্রথম থেকেই খুশীতে আটখানা। সবাইকে বলতেন- 'বউ আসার পর থেকে আমার বিজনেস খুবই ভালো যাচ্ছে। বউ আমার ভাগ্যবতী।'

শ্বশুর বাড়ির প্রশংসায় তুইও ছিলি পঞ্চমুখ। তোর শ্বশুর বাড়ির গল্প শুনতে শুনতে আমার চোখ ছানাবড়া, মুখ কাকের মতো হা হয়ে থাকতো! শুনতে শুনতে হঠাৎ নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম।

বুবু, তোর শ্বশুর কিন্তুশ্চশ্চু আমাকে ভীষণ আদর করতেন। আমাকে আমার নাম ধরে ডাকতেন না, 'মা' বলে ডাকতেন। বলতেন- 'তুমি আর আমার মেয়ে রীনু দেখতে একই রকম।'

রীনুর সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমি তোর শ্বশুরবাড়ি যেতাম আর রীনু আমাদের বাড়ি আসতো। আমরা জড়াজড়ি, গলাগলি হয়ে থাকতাম। কারণে-অকারণে হাসতাম। রীনুর বর থাকতো দেশের বাইরে। রাতে শুয়ে শুয়ে সে তার বরের গল্প শোনাতো। তার বর কি ভঙ্গিতে হাঁটে, কিভাবে কথা বলে, কিভাবে হাসে-এমনভাবে সে বর্ণনা করতো যে, আমি বুঝতে পারতাম, লোকটি সর্বদা তার চোখের সামনে ভাসছে। তার কল্পনায় সর্বদা সে সচল, সরব, সজীব সর্বদা বিরাজমান।

একবার তোর শ্বশুরবাড়িতে একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল। রীনুদের কেমন যেন আত্মীয়। রাতে সবাই শুয়ে পড়লে রীনু ফিসফিসিয়ে বললো-'চলো, আড়ি পেতে দেখবো।'

আমি ঘুমের ঘোরে বললাম- 'কি পেতে?'

www.pathagar.com

'বুদ্ধু, বুঝতে পারছো না! ওরা বাসর ঘরে কি করছে, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবো।'

খুব সন্তর্পনে পেছনের দরজা খুলে আমরা বাগানের দিয়ে ভেতর বাসর ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনে রোয়াকের ওপর কে যেন পায়চারি করছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

রীনু বললো-'খুব সাবধান, একটা পাতার শব্দও যেন না হয়।'

সামান্য ফাঁকা দিয়ে রীনু প্রথমে দেখলো। পরে নিজের মাথা সরিয়ে আমাকে বললো-'দেখে নাও।'

আমি নিজেই যেন খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম, তবু ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম-বেলা একহাত ঘোমটা টেনে বসে আছে। তার বর চেষ্টা করছে ঘোমটা সরাতে। বেলা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বর হাসে, কতোক্ষণ চুপ করে থাকে। এরপর ওকে হাসাতে চেষ্টা করে-

'তুমি কতো সুন্দর তা তোমার হাত দেখেই আমি বুঝেছি। আমারও হাত সুন্দর, তবে আমার কান তো তুমি দেখোনি! একেবারে হাতীর কানের মতো। আর দেখো না তাতে কতো বড় বড় পশম। শুধু কি কানেই পশম? আরে ভাই আমারতো ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত শুধু পশমই পশম।'

বেলা ঘোমটার নীচে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ওর বর আরো কাছে ঘেঁষে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে-'জানো আমার দাদা, সরি দাদা নয়, পরদাদার পরদাদা কি ছিল?'

বেলা মাথা নেড়ে বোঝায় সে জানে না।

এবার ওর বর আরো গভীর হয়ে কাছে আসে। মুখের কাছে মুখ এনে বলে-'বললে ভয় পাবে না তো?'

বেলা মাথা নেড়ে বোঝায়, ভয় পাবে না।

বর ওর কোলে হাত রেখে বেলার হাতের আঙুল ধরে নাড়াচাড়া করে আর বলে-'যদি ভয় পাও! না ভাই, তুমি ভয় পাবে। আমার এই সারা শরীরে পশমগুলোতে আর এমনি এমনি হয়ে যায়নি। এ আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আমার পূর্বপুরুষরা ছিল...অর্থাৎ তারা ছিল।'

বলতে বলতে থেমে গেলো বর-'নাহ্ বলা যাবে না।'

এবার বেলার ঘোমটা গড়িয়ে পড়ে পিঠের ওপর। কারণ সে সোজা হয়ে মাথা তুলে বসে তার বরের দিকে তাকিয়েছে। বর হালকা হেসে বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো বেলার দিকে। বেলা লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে ঘোমটা তুলে দেয়ার জন্য হাত তুললো। বর আস্তে করে হাত চেপে ধরলো।

www.pathagar.com

বেলা বললো—'বলো।'

'কি বলবো?'

'তোমার পরদাদার পরদাদা জানি কি ছিল?'

বর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো- 'মানুষ।'

'মানুষ! তবে যে বললে...'

'কি বললাম! তুমি কি ভেবেছো?'

'না কিচ্ছু না।' বেলা লজ্জা পায়।

বর বেলার নাকের সাথে নিজের নাক ঠেকিয়ে বলে- 'উহুঁ! আমি জানি, তুমি কি ভেবেছিলে।'

বেলা লাজুক ভাবে বলে- 'কি?'

'বানর' বলেই বেলার দিকে তাকিয়ে চোখ মারে।

বেলা হেসে মুখ সরিয়ে নেয়। এরপর বরের কানের কাছে মুখ এনে বেলা কিছু বললো। বর উঠে এসে আলো নিভিয়ে দিলো। আমরা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে ওদের গুঞ্জন, ফিসফিসানী কানে আসছিল ঠিকমতোই।

বর বলছিল—'আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

বেলার আওয়াজ, 'জানি না- যাও।'

বরের কণ্ঠ- 'এই মানুষটাকে আপন করে নিতে পারবে না?'

বেলার কোনো শব্দ শোনা যায় না। বরের ফিসফিস আওযাজ শোনা যায়- 'ঘুম পাচ্ছে বেলা? বেলা, বেলা, বেলা, আমার বেলা! বেলা, আজ আমরা ঘুমোবো না। সারা রাত কথা বলবো।'

রীনু আস্তে ধাক্কা মারলো আমাকে- 'এ্যাই, আমার কিন্তু নাকে একটা মশা ঢুকে গেছে। হাঁচি আসছে এখন।'

'ভাগো, পালাও তাহলে।'

আমরা চুপিসারে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। রীনু ক্রমাগত ক'টি হাঁচি মেরে বললো- 'শালার মশা, আর জায়গা পায়নি, নাকের ছেঁদার ভেতর বিনা পারমিশনে ল্যান্ড করেছে।'

বিছানায় শুয়ে রীনু নিজের বাসর রাতের কথা বলতে শুরু করলো- 'আমাকে তো মাথায় ঘোমটাই তুলতে দেয়নি। বলেছে- জানো রীনু, এতো সুন্দর মেয়ে আমি জীবনেও দেখিনি। তোমাকে প্রাণভরে দেখতে দাও। আমি তো এমন কোনো ভালো কাজ করিনি। কোন্ কারণে আল্লাহ্ আমাকে এতো বড় পুরস্কার দিলেন!'

www.pathagar.com

রীনুর কথা আমার কানে খুব বেশী যাচ্ছিল বলে মনে হয় না। আমি তখন ভাবছিলাম, এর নাম কি তাহলে বাসর রাত! আমি তো মনে করতাম, বাসর রাত মানে একটা মেয়ে ফুলে-ফলে সাজানো বিছানা পেয়ে সারাদিনের ক্লান্তি মেটাতে একটু শোবে আর আরামে ঘুমিয়ে পড়বে। ব্যথা আর যন্ত্রণায় যখন হঠাৎ জেগে ওঠবে তখন দেখবে দৈত্যের মতো একটা বিশালকায় মানুষ তাকে অজগরের রূপ ধরে জড়িয়ে রেখেছে। সে ভয়ে, চিৎকার করে উঠতেই তার মুখ চেপে ধরেছে!

বাসর রাত মানে তো ভয় আর শংকা, ব্যথা আর যন্ত্রণা, অত্যাচার আর নির্যাতন।

স্বামী কি তাহলে বন্ধুও হতে পারে! বেলা কি তার স্বামীকে ভয় পাবে আমার মতো?

যে স্নেহ করে, আদর করে, কৌতুক করে-গল্প শোনায়, হাসে, হাসায় তাকে ভয় পাবে কি কারণে! স্বামী কি শোষক না সহচর!

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম-না সারারাত আর ঘুমুতে পারিনি, আজ আর তা মনে নেই।

তবে এটা ঠিক যে, আমার ঘুম এখনও আগের মতোই আছে, যেমনটি ছিল ছোটো বেলায়। তোর কি মনে পড়ে, ছোটবেলায় আমি একবার ঘুমোলে আর সহজে কেউ আমাকে জাগাতে পারতো না। কতোবার তুই টেনে তুলে বসিয়েছিস্। টেনে টেনে বিছানা থেকে ফেলে দিয়ে হেসেছিস্, তবু ঘুম ভাঙতো না।

তোর কি মনে পড়ে, আমরা যখন খুবই ছোট ছিলাম সে সময়ের কথা?

খুব ভোরে উঠে আম কুড়োনোর তোর খুব শখ ছিল। আমাকে প্রায়ই টেনে-ছিঁচড়ে তুলে তোর সাথে নিয়ে যেতি আম কুড়োবার জন্য। আমাদের আম গাছের আবার নামও ছিল। কাচারী ঘরের ওপর ঝুলে পড়া বিশাল আম গাছটিতে যে আম ধরতো তা সাইজে ছিল খুবই বড় বড়। আমরা গাছটাকে বলতাম 'ভূতা' আমগাছ। প্রচুর আম হতো সে গাছে। খুব ভোরে উঠে আমরা দু'জনে পাকা আম কুড়িয়ে আনতাম।

একদিন এমনি ভোরে উঠেছি। গাছের পনেরো/বিশ গজ দূরে থাকতেই দেখলাম, আম গাছের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা কি একটা-যার-হাত-মাথা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভোরের আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে সাদা কাপড় পরে লম্বা কি একটা যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কি এটা! এতো লম্বা তো কোনো মানুষ হতে পারে না। হাত-পা, মাথা কিছুই নেই। দেখেই আমরা উল্টো দিকে মারলাম দৌড়। ঘরে ঢুকে দরজা ভালো করে এঁটে বন্ধ করে শুয়ে চোখ বন্ধ করে রইলাম দু'জনে।

এরপর আর কোনোদিন আম গাছের তলায় যাইনি। তোর কি মনে আছে এ ব্যাপারে পরে কি শুনেছিলাম? বাড়িরই একজন দু'হাতে পাতিল নিয়ে দু'হাত উঁচিয়ে ধরে তার ওপর সাদা কাপড় ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিল ।

www.pathagar.com

কি আশ্চর্য! কি বোকাই ছিলাম আমরা। আমরা তো একশ' ভাগই নিশ্চিত ছিলাম যে, কোনো সন্দেহ নেই, ভূত দেখেছি।

ভূত কি এর আগেও আমরা দেখিনি? তোর মনে নেই বুবু!

আব্বা হিন্দু বাড়ি কিনলেন। আমরা বলতাম নতুন বাড়ি। দাদা ও মেঝো ভাইকে দিলেন নতুন বাড়ি থাকতে। বাড়ি খালীই পড়ে থাকতো। ভাবীরা থাকতেন শহরে। মাঝে মাঝে দাদা আসতেন ভাবীকে নিয়ে বেড়াতে। ক'দিন পরপরই দাদাকে এ শহর থেকে ও শহরে বদলী করা হতো। সাধারণতঃ ঈদের ছুটিতে দাদা বাড়ি আসতেন ভাবীকে নিয়ে।

দাদার ঘরটা ছিল বাড়ির পেছনের দিকে। মেঝো ভাই'র ঘর ছিল বাড়ির সামনের দিকে। মাঝখানে বিরাট উঠোন। একপাশে পুকুর, অন্যপাশে গাছপালা ঘেরা সাজানো বাগান। বাগানের সাথেই একটা খালি ভিটে বাড়ি। ভিটে বাড়িতে জ্বালানী কাঠের স্তুপ।

সত্য বলতে কি, বড় ভাবীকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম। ভাবী বাড়ি এলেই আমি ও বাড়ি চলে যেতাম। বিকেলে আম্মা কাউকে পাঠিয়ে আমাকে ও বাড়ি থেকে আনতেন। যখনই যেতাম আমি আর আসতে চাইতাম না। ভাবীর ছেলে-মেয়েরা ছিল আমার সমবয়সী। আমি সব সময় ওদের সাথে খেলাধুলা করতাম। ভাবী আমাকে খুব আদর করতেন। অনেক সময় আম্মা লোক পাঠালেও আমি লোক ফিরিয়ে দিতাম। রাতে থেকে যেতাম ও বাড়ি। দাদা বাড়ি থাকলে ভাবীকে বলতেন- 'ওকে কেন পাঠিয়ে দিলে না?'

ভাবী বলতেন- 'ছোট মানুষ যেতে চায় না। বাচ্চাদের সাথে সারাদিন খেলাধুলো করছে। যেতে না চাইলে জোর করে পাঠিয়ে দিই কি করে?'

'এ বাড়িতে ওর কতোটুকু যত্ন হয়?'

'তুমি কি বলতে চাও, আমি তোমার বোনের যত্ন নিই না?'

'তা বলছি না। বলছি মায়ের মতো যত্ন কি কাউকে দিয়ে হয়? শীতের দিন! ওর লেপ সরে গেলে বারবার ছোট মা ওর গায়ে লেপ তুলে দেবে। আমরা কি তা করবো না করতে খেয়াল থাকবে আমাদের!'

দাদার কথা অবশ্য ঠিকই ছিল। আমি সর্বদাই আম্মার পাশে শুতাম। আম্মা আমাকে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা নজরে রাখতে না পারলে যেন শান্তি পেতেন না।

আম্মা ছিলেন ভীষণ সাহসী মহিলা। আম্মার তুলনায় আব্বা ছিলেন কিছুটা ভীতু। মাঝে মাঝে বড় ভাবী ও মেঝো ভাবী একা একা বাড়িতে থাকলে আম্মা চলে যেতেন ও বাড়ি। আম্মার সাথে আমিও যেতাম। আমার খুব মজা হতো তখন।

সেবার দু'ঘরে দু'ভাবী। দু'জনেরই অবস্থা শোচনীয়। দু'জনই ছিল অন্তঃসত্ত্বা। দাদা ও মেঝোভাই শহরে। বাড়িতে দু'ঘরে দু'বউ বাচ্চা-কাচ্চাসহ। আম্মা প্রতিদিন বিকেলে চলে যান বউদের কাছে থাকার জন্য।

www.pathagar.com

ভোর রাতে মেঝো ভাবীর ছেলে হলো। সারা বাড়িতে হৈ চৈ। চাঁদের মতো সুন্দর ছেলে। দুনিয়াতে আসার সাথে সাথেই চোখের কালো পাপঁড়ি মেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। সবাই খুব খুশী। বড় ভাবীও হৈ চৈ শেষে ভোরের দিকে নিজের ঘরে এলেন। আম্মা সব গুছিয়ে যাচ্ছেন গোসল করতে, অমনি ছিল বড় ভাবীর ঘরে। ধাত্রী সবেমাত্র গোসল সেরে হাতে-পায়ে তেল মাখছিল রোদে বসে। আম্মা ডাকলেন তাকে। কিছুক্ষণ পরই বাচ্চার কান্না। সারা বাড়ি জুড়ে হাসি-আনন্দের বন্যা, বড় ভাবীরও ছেলে হয়েছে।

ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। স্বাভাবিকভাবেই আম্মাকে থাকতে হবে বউদের কাছে। এটা সবার চেয়ে আমার জন্য ছিল বেশী আনন্দের। কারণ আম্মার সাথে আমিও থাকতে পারবো। আমাকে আর পায় কে।

সারাদিন খেলাধুলা, গান-গল্পের পর সন্ধ্যের সময় মাষ্টার সাহেবের কাছে পড়তে বসতাম আমরা। তিনি চলে গেলে লেপের তলায় ঢুকে আবার গল্প শুরু করতাম। জানি না, এতো কথা কি করে পেটে জমা থাকতো।

মেজো ভাবীর দু'টো কাজের লোক ছিল। জামাল বাইরের কাজ করতো আর 'সরু' নামের মেয়েটি ঘরের সব কাজ সামলাতো। বড় ভাবী বাড়ীতে মাঝে মধ্যেই বেড়াতে আসতেন। তবু তার একটা বাঁধাধরা কাজের ছেলে ছিল। বাচ্চাদের কোলে রাখা ছাড়াও ভেতর বাড়ির কিছু কিছু কাজও সে করতো। ওকে আমরা ডাকতাম সেরাজল। ভাবী শহরে কিংবা বাড়ি যেখানেই থাকেন, এই সেরাজল ভাবীর সাথে সাথে থাকতো।

ভাবী বাড়ি এলেই 'সরু'র বড় বোন আসতো। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে কাজ করতো এবং সন্ধ্যের পর সান্‌কী ভরে খাবার তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যেতো।

সরু আর জামালকে নিয়ে মেঝোভাবীর খুব সমস্যা ছিল। দু'জনে একেবারেই বনিবনা ছিল না। এটা ওটা নিয়ে দু'জনার ঝগড়া চলতেই থাকতো। সেদিন আম্মা সরুর ওপর রাগ করে জামালকে বাড়ি পাঠিয় দিলেন। সরুকে বললেন-'জামালের কারণে তোর যখন এতো অসুবিধে, ঠিক আছে, জামাল ক'দিন ছু'টিতে থাক। তুই একা সব কাজ করে দেখ কতটুকু পারিস।'

সরু নামের মেয়েটি আকারেও সরু ছিল। সে আবার বেশ রাগীও ছিল। তেজ দেখিয়ে বলেছে-খালা, আমি হলাম গিয়ে চান্দার বাপের মাইয়া। চান্দার মায়ের ঝিয়েরা কামেরে ডরায় না। জামাইল্লারে যদি আমি ভুলাইয়া না দিছি হেইলে আমি সরু নাম বদলাইয়া ফালামু।'

জামাল চলে গেলে সরুর কাজ বেড়ে যায়, কিন্তু তাতে সরুর কোনো দুঃখ ছিল না। বরং শব্দ করে গান গাইতে গাইতে সে সব কাজ করতে লাগলো। সন্ধ্যে হতেই আম্মা বললেন-সরু, নতুন বাচ্চার ঘর, তাছাড়া বেশ শীত পড়েছে, ঘরে আগুন জ্বালিযে রাখতে হবে। ভিটে বাড়ি থেকে কাঠ এনে রাখিস।'

www.pathagar.com

'হাতের কাজগুলো শেষ করেই লাকড়ী আনতে ভিটেয় যাবো খালা। দু'ঘরেই কি জ্বালাবো?'

আম্মা বললেন- 'হ্যাঁ। সেরাজলকে নিয়ে গিয়ে দু'ঘরের জন্যই লাকড়ী এনে রাখ।'

কাজের চাপে সরু ভুলে গেলো লাকড়ী আনার কথা। রাতে আম্মা যখন বললেন—'সরু, ঘর তো বেশ ঠান্ডা। শীত বাড়ছেই। আগুনটা জ্বেলে রাখ।'

সরুর তখন খেয়াল হলো, লাকড়ী তো আনা হয়নি ভিটে থেকে! অন্ধকার হয়ে গেছে। একা যাবে কি করে! সেরাজলকে ডাকলো—'সেরারে, অ সেরা, আমার লগে আয়, ভিটায় যামু। অন্ধকার অইয়া গেছে, আমার ডর লাগে।'

সেরার বয়স আর কতোইবা ছিল, নয় কি দশ। হলে কি হবে, কথায় সরুর চেয়ে সে কম পাকা ছিল না। সরুকে বললো—'তুমি তো পুরা মাইয়া লোক। বাড়ির পিছে ভিটা, দশ কাইকের জাগা না। আর তুমি ডরাও। আমি বাপের বেডা। যত অন্ধকারই হউক না ক্যান, বাতি ছাড়া একলা হাঁইটা মতলব হাট যাইতে পারমু।'

সরু মুখ ভেংচিয়ে বলে—'যা দেহি বাতি ছাড়া। মতলব হাট যাওন লাগবো না। একটু ভিটায় যাইা কয়খান দাউরা আনতো দেহি। চাই তোর গুরদাডা কত বড়।'

সেরাজল লাকড়ী আনতে যায় ভিটেয়। যেতে যেতে বলতে থাকে—'গুরদা লাগেনি? ভিডায় যাইতে আবার কিসের গুরদা! গুরদা বাদেই, বলেই চেঁচিয়ে উঠলো—'বুয়াগো, ভূত! ভূত! সাদা ভূত! ভূত... '

সেরাজলের চিৎকারে সারা বাড়ি কেঁপে উঠলো। আমরা যে যেখানে ছিলাম, দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা বন্ধ করতে লাগলাম।

বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। মাষ্টার সাহেব সন্ধ্যের আগেই বাড়ি চলে গেছেন। জামালও নেই। দু'ঘরে আঁতুড়। দু'বউ, ছোট ছোট সব বাচ্চা-কাচ্চা।

সেরাজলের চিৎকার শুনে সরুও চিৎকার শুরু করলো। আম্মা ধমকে উঠলেন—'এ্যাই, হৈ হল্লা করিসনে। কোথায় ভূত? তোদের মাথায়?'

'ভিটেয় ভূত আছে খালা। আমি দেখেছি।' সেরাজন বলে।

বড় ভাবীর ঘরের পেছনের জানালার ফাঁকা দিয়ে আম্মা একটু তাকিয়ে দেখলেন।

বাইরে ভীষণ কুয়াশা, বিদঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারে একটা সাদা কিছু নড়ছে। নিজের চোখে দেখেও আম্মা বিশ্বাস করতে পারলেন না। ভূত হয় কি করে? ভূতে যে তার বিশ্বাসই নেই!

একটু পর আম্মা আবার দেখলেন, সাদা ভূত নড়ছেই না শুধু, এগিয়েও আসছে। ক্রমশঃ বাড়ির দিকে এগুচ্ছে হেলে দুলে। ফাঁক দিয়ে সরুও দেখলো। দেখেই চেঁচিয়ে

www.pathagar.com

বলে উঠলো—'জামাইল্লা শয়তান ছুটি নিলো ক্যান? জামাইল্লা থাকলে এখন বাতি লইয়া ভিটায় যাইত। খালা, জামালেরে যাইতে দেয়া ঠিক অয় নাই!'

আমি সত্যিই সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আম্মার সাহস দেখে।

আমরা সবাই যদিও ভয়ে চুপসে গেছিলাম, তবু কৌতুহল থামাতে না পেরে আম্মাকে লুকিয়ে জানালা একটুখানি ফাঁকা করে করে দেখেছি। দেখেছি ওটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

আম্মা উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন—'ওখানে কে? কে ওখানে?'

কোনো শব্দ নেই। বরং ওটা আরো এগিয়ে আসতে থাকলো। হেলে দুলে আসছে। আসতে আসতে ঠিক বড় ভাবীর ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো।

এবার আম্মা সরু আর সেরাজলকে বললেন—'কয়েক মুঠো পাটখড়ি মাথায় আগুন ধরিয়ে খোলা আগুনটা নিয়ে আয়। আমি আগুন হাতে এগিয়ে গিয়ে দেখবো, কে ওখানে।'

সরু আর সেরাজলকে নিয়ে আগুন হাতে আম্মা এগুলেন। সরু ও সেরাজলের হাতেও আগুন। আম্মা এগুচ্ছেন আর চালাকী করে মাষ্টার সাহেবকে ডাকছেন, জামালকে ডাকছেন।

আগুন হাতে ঘরের পেছনে গিয়ে তো অবাক! একটা মেয়ে মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে! হাতে তার সুপুরী ডালার খোল, সাদা ধবধবে খোল।

মেয়ে লোকটাকে দেখে সবাই চিনতে পারলো। পাশের গ্রাম থেকে সে আসে ভিক্ষে করতে। বোবা। রাত হলে চোখে কম দেখে। কথা বলতে পারে না বলে গাঁয়ের লোকেরা তাকে বুবি ডাকে। আম্মার উপস্থিতি টের পেয়ে আগের মতোই হাতের খোল নেড়ে নেড়ে মুখ ভঙ্গি করে কিছু বলতে চাইলো। বুবি বোঝাতে চাইলো সে খুব ক্ষুধার্ত, কিছু খাবার চায়!

সেদিন আম্মা সাহস করে এগিয়ে না গেলে দরজা-জানালা বন্ধ করে ভূতের ভয় নিয়ে আমরা রাত কাটাতাম। আর হয়তো এ বিশ্বাস প্রকট হয়ে যেতো যে, আমি নিজের চোখে ভূত দেখেছি।

এ ঘটনা কিন্তু তুই নিজে দেখিসনি বুবু। কারণ সে রাতে তুইও বাড়ি থাকিস্‌নি। আমি ছিলাম আম্মার সাথে। সকালে সবার আগে তোকেই ভূত নামের বোবা মেয়ে লোকটির কথা এক নিঃশ্বাসে বলেছি।

বুবু বলতে পারিস, এ নিয়ে তা ক'বার হলো?

আসলে আমি তো এমনিতেই একটু বেশী কথা বলতাম। মাঝে মাঝে তুই ধমকে বলেছিস—'এতো বকবক করতে তোর ইচ্ছে হয়? গাল ব্যথা করে না? আর বলতে হবে না। এটা আগেও শুনেছি।'

www.pathagar.com

কখনো বলেছিস্—'এটা তো বাসী গল্প। এ গল্প এর আগেও তোর কাছে তিনবার শুনেছি।'

আসলে আমার মনেই থাকতো না যে, এ গল্প বা সে গল্প এর আগেও বলেছি। অবশ্য বলবোইবা আর কাকে। ঘুরে ফিরে সেই তুই। আর তো কাউকে বলার ছিল না।

গাঁয়ের অন্যান্যদের চেয়ে আমরা একটু স্বতন্ত্র থাকতাম। যার তার সাথে মেশা, এ বাড়ি ও বাড়ি ঘোরা আমাদের জন্য নিষেধ ছিল।

আমাদের আব্বার মতো আর কেউ তো গাঁয়ে ছিল না। আব্বা ছিলেন বিচারক। চাকর, নওকর, চৌকিদারে ভরা বাড়ি। বড় বড় মাছ নিয়ে ভোরবেলা মাছওয়ালা আসতো। দুধওয়ালা আসতো গাই দুইয়ে দিতে। পাঁচটা দুধের গাই সে এক এক করে দুইয়ে দিয়ে চলে যেতো। নাপিত এসে নখ কেটে দিতো। আরো অনেক কিছুই আমাদের বাড়িতে হতো। যা অন্য কোনো বাড়িতে সাধারণতঃ হতো না। আজ তার অনেক কিছুই ভুলে গেছি।

আমাদের শোবার ঘরটা ছিল বেশ বড়। সামনের ঘর আর পেছনের বারান্দা বাদ দিলেও বাকী তিনটি কক্ষ কম বড় ছিল না। আমি আম্মার খাটে শুতাম। তুই বড় আম্মার সাথে। রাতে জগী খালা যখন আমাদের শুইয়ে দিয়ে খাবার ঘরে চলে যেতেন তখন আমি তোর কাছে এসে তোকে ডাকতাম—'এ্যাই বুবু, চল আমার কাছে শুবি।'

তুই বলেছিস—'আম্মা মারবে, ছোট মা রাগ করবে।'

আমি বলতাম—'একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছু বলবে না, এখনো তো দু'জনে গল্প করছে বারান্দায় বসে।'

তাই করতাম। দু'বোন একত্রে শুয়ে গলাগলি হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। একবার ঘুমুলে কোন্ মা বাচ্চাকে জাগিয়ে তোলে? আমাদেরও কেউ তুলতো না।

বড় আম্মা আমাকে এতো বেশী আদর করতেন যে, আমি বড় হওয়া পর্যন্ত মনে করতাম তিনিই বুঝি আমার আপন মা। আসলে আমি তো একথাটাই বুঝতে পারিনি যে, আমাদের ঘরে দু'জন মা কেন? বাড়িতে বা বাড়ির আশে পাশে সবার ঘরে একজন মা আর আমাদের দু'জন। একবার জগী খালা যখন আমাদের ব্যাঙমা-ব্যাঙমী আর স ৎমা ও রাজপুত্রের গল্প বলছিল তখন গল্প তো শুনেছি তন্ময় হয়ে। এরপর প্রশ্ন করেছি—'জগী খালা, সবার তো একটা মা, তোমার কয়টা মা ছিল?'

'একটা। আমার মা তো এখনো আছে। খুব বুড়ো হয়ে গেছে।'

আমি তখন প্রশ্ন করেছি—'আচ্ছা, আমাদের কেন দুইজন আম্মা! সবার যে নাই?'

'সবার থাকে না।'

www.pathagar.com

'কেন থাকে না।'

'সবার দু'জন বউয়ের দরকার হয় না, তোমার আব্বার দরকার আসে তাই।'

'কেন দরকার হয়?'

আমি উত্তরের আশায় তাকিয়ে থাকি। জগী খালা বিরক্তির সাথে বলতো—'তুমি বেশী বেশী প্রশ্ন করো। এটা তোমার জানার কি দরকার।'

জগী খালার ধমকে আমি চুপসে যাই, কিন্তু প্রশ্নটা মনে থেকেই যায়। রাতে আবার যখন জগী খালা আমাকে বিছানায় দিয়ে মশারী ঠিক করে দিচ্ছিল তখন আপন মনে বলছিলাম—'জগী খালা একটা খালী মট্‌কার মতো, ভেতরে কিচ্ছু নেই।'

'তুমি আমাকে গাল দিচ্ছ?'

'গালি দিচ্ছি না, বলছি তুমি কিচ্ছু জান না।'

'কি জানি না?'

'কিছুই জান না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলো, আমি জানি না আর নয় তো বলো, তোমার জেনে কি লাভ।'

'বুঝেছি! আচ্ছা বল তো, আমি কি করে বলবো তোমার আব্বার কেন দু'জন বউ? কিন্তু তোমার তাতে কি অসুবিধা?'

'অসুবিধা কি! আমার তো আরো মজা। আম্মা আমাকে মারতেই পারেন না বড় আম্মার জন্য। বড় আম্মা না থাকলে আমি তো আম্মার মার খেয়ে খেয়ে মরেই যেতাম।'

'তাহলে আর দুই মা নিয়ে এতো লম্বা লম্বা প্রশ্ন কর কেন?'

'প্রশ্ন কোথায়? আমি তো শুধু জানতে চাইলাম। কারণ সবার তো দুই মা নেই!'

'সবার হয়তো প্রয়োজন নেই অথবা সামর্থ্য নেই।'

'সামর্থ নেই মানে?'

'মানে তোমার আব্বা বড় লোক, তোমার আব্বা শিক্ষিত। তোমার আব্বার অনেক জমি-জমা, টাকা পয়সা আছে। দেখো না তোমার আব্বার কতো নাম, কতো যশ। জুরীর হাকিম তিনি। জজ কোর্টের জুরর তার মতো বিচার কয়জন করতে পারে? কয়জনের পেছনে পেছনে তার মতো লোকজন থাকে, চৌকিদার থাকে?'

জগী খালার কথা শুনতে শুনতে গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। সেই থেকে আমি মনে করতাম-আব্বা বড় লোক, আব্বা সম্মানিত। গাঁয়ে সবার তুলনায় সব কিছুই তাঁর বেশী বলেই আমরা একাধিক মা পেয়েছি। দু'জনই আমার মা। এর মধ্যে একজন আমার সৎমা, এটা আমি বুঝতে পারিনি। একথা জেনেছি বহুদিন পর বয়স তখন আট অথবা নয়।

www.pathagar.com

বড় আপার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম সবাই। আপার শ্বশুর ছিলেন সরল-সোজা মানুষ। সমাজজ্ঞান ছিল তার খুব কমই। কোথায় কি বলতে হয়, কাকে কি বলতে হয়-এসব তিনি তেমন জানতেন না। লোকেরা অবাক হতো দুলাভাইকে দেখে। এ বাপের ঘরে এমন সোনার টুকরো ছেলে হলো কি করে? অবশ্য দুলাভাই'র আম্মা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী মহিলা। কি করে যে বেচারী সারাটা জীবন ও মানুষটার সাথে জীবন কাটিয়েছেন তা শুধু তাঁর মালিকই বলতে পারেন।

বুবু, তোর কি মনে পড়ে আপার বিয়ের সময়ের কথা। তোর কি মনে পড়ে লালুকে নিয়ে সেদিন কি হয়েছিল? লালুর কান্না, লালুর সে আহাজারী আমার তো আজো মনে আছে। আমরা লালুকে কোথায় পেয়েছিলাম!

সে কতোকাল আগের কথা!

আপার বয়স তখন আট কি নয়, আমার তিন কি চার।

আমাদের বাড়ীতে যখনই একটু বাড়তি কাজ পড়তো, বড় আম্মা রাবেয়ার মাকে ডাকতেন। তাকে সবাই বলতো রাবির মা।

সেদিনও দরকার ছিল রাবির মাকে। বাড়িতে কি কারণে যেন তেমন কেউ ছিল না, যাকে ওখানে পাঠানো যায়। শেষে আপা বললো—'আমি গিয়ে ডেকে আনি।'

বড় আম্মা বললেন—'ঠিক আছে যাও। যাবে আর আসবে, পথে কোথাও দেরী করবে না। আমি এখান থেকে তাকিয়ে থাকবো।'

আমি বললাম—'আমিও যাবো।'

বড় আম্মা বললেন—'যা, এটাকেও নিয়ে যা।'

রাবির মা'র শুধু বাড়িই নয়, আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানে দাঁড়ালে ঘরও দেখা যায়। বড় আম্মা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন।

রাবির মা'র বাড়িতে ঢুকেই আমাদের চোখ ছানাবড়া। তার ছেলে আবদুল্লা পাঁচ/ছয়টা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে খেলছে। আপা তাকিয়ে থাকলো। রাবির মা বললো—'নেবে একটা?'

আপা খুশীতে মাথা নেড়ে বললো—'ঐ লাল কুকুরটা সবচেয়ে বড়, নাদুশ নুদুস।' শেষে লাল কুকুরটা নিয়ে আমরা বাড়ি এলাম।

বড় আম্মা এই কুকুর ছানাটির নাম দিলেন 'লালু'। লালুকে ভালো ভালো খাবার দেয়া হতো। আপাকে সব সময় পাহারায় রাখতো কুকুরটা। আপা স্কুলে গেলে লালু স্কুলের বারান্দায় শুয়ে থাকতো। আপা যেখানে যেতো লালু থাকতো আপার পেছনে পেছনে।

আমরা বেড়াতাম অনেক। যখন আম্মা আর বড় আম্মা মিলে নতুন শাড়ী পরে বড় আম্মার বাবার বাড়ি অথবা আমার নানার বাড়ি যেতেন তখন আমরাও সাথে যেতাম। লালুও বাদ পড়তো না।

দুপুরে সবাই ঘুমুলে লালুও শুয়ে থাকতো বারান্দার সিঁড়ির ওপর মাথা ফেলে। কারো সাধ্য ছিল না লালুর সামনে দিয়ে সন্তর্পনে ঘরে ঢোকে। লালু ঘেউ ঘেউ করে আওয়াজ দিতো। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, লালু আমাদের সব কথা বুঝতো, আমাদের ঘরের সব

www.pathagar.com

জিনিস চিনতো। আব্বা সব সময় নিজের খাবার থেকে তুলে লালুকে খেতে দিতেন।

আব্বা বলতেন—'সব মানুষ যেমন ইন্টেলিজেন্ট হয় না, সব জন্তুরও তেমন বোধ-বুদ্ধি থাকে না। তবে লালুর আছে। আমার তো মনে হয়, লালু সাধারণ কুকুর নয়। ট্রেনিং দিতে পারলে এটাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে।'

আপার যখন বিয়ে হয় তখন বর্ষাকাল। ঢালু এলাকা বলে বর্ষা এলেই আমাদের বাড়ি পানি ছুঁই ছুঁই করে, পুরো বর্ষায় এলাকা থাকে ডুবে। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে আপাকে শ্বশুরবাড়ি নেয়া হবে। সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো পানি। শেষতক পালকী সাজানো হলো। সাজানো পালকী তুলে দেয়া হলো সাজানো নৌকায়।

সে কি কান্না আপার!

আপা নৌকা করে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। আগে-পিছে আরো বেশ ক'টি নৌকো ভরা বরযাত্রী।

হঠাৎ লালু করুণ কণ্ঠে কেঁদে উঠলো। ঘেউ ঘেউ করে নয়, 'কু..উ,...মতন শব্দ করে পা বাড়িয়ে দিলো আপার নৌকোর দিকে। মাঝি তাড়িয়ে দিলো লালুকে। নৌকা ছেড়ে দিলো। লালু সাঁতরে চললো আপার নৌকার সাথে। আপার শ্বশুর ধমকে উঠলেন—'এ কি কান্ড, বউয়ের সাথে আমরা কুত্তাও নেবো নাকি।? তাড়াও, লগি মারো।'

লালুকে লগি মেরে তাড়ানো চেষ্টা করেও তাড়ানো গেলো না। 'কু-উ-উ-উ' আওয়াজ করতে করতে নৌকার পেছনে পেছনে অনেক দূর সাঁতার কেটে, লগির মার, বৈঠার ঘা খেয়ে ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে অবস্থায় ফিরে এলো লালু। কাচারীর সামনে নৌকায় উঠাবার আগে আপার পালকী যেখানে রাখা হয়েছিল, লালু ওখানে বসে রইলো।

আব্বা ডেকে আনলেন, বড় আম্মা খেতে দিলেন। লালু খাবারে নাক লাগিয়েও দেখেনি। কতো আদর করেছেন বড় আম্মা। কেঁদেছেন আপার কথা বলে বলে, লালু তবু খাবারে মুখ লাগায়নি একে একে তিন দিন। এরপর লালুর জ্বর হয়, কাঁপতে কাঁপতে এক সময় লালু চোখ বন্ধ করে চিরতরে। লালুর দু'চোখে তখনও ছিল পানি। লালুর মৃত্যুর খবরে আপা সবার চেয়ে বেশী কেঁদেছেন। আফসোস করে বলেছেন—'সেদিন আমার সাথে লালুকে আসতে দিলে এ অবস্থা হতো না।'

আপার শ্বশুরের চোখ ছিল কুতকুতে মানে আকারে একটু ছোট। হাসলে মনে হতো চোখ বন্ধ হয়ে আছে। লালুর জন্যও কাঁদতে দেখে আপাকে হেসে বলেছেন—'দুনিয়াতে কুত্তার অভাব আছে নাকি মা! কুত্তার জন্য মানুষ কাঁদে নাকি?'

শ্বশুরের কথায় আপা জবাব দেননি। কারণ আপা জানতেন, তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে, সোজা-সরল মানুষ। কুকুর তো কুকুরই। তার আবার বোধ-বুদ্ধি থাকবে, সে বন্ধুর মতো কাজ করবে এসব তো তার কাছে পাগলের প্রলাপের মতো মনে হবে। আপা তাই চুপ করে থাকতেন।

মানুষের বেশী সরলতার কারণে অনেক সময় আবার সমস্যাও বেঁধে যায়। আমার সাথেও হয়েছিল তাই। জগী খালার কাছে শুনবার পর থেকে আমি মনে করতাম,

www.pathagar.com

আব্বার দুই স্ত্রী অর্থাৎ আমাদের দুই মা হচ্ছেন আমাদের জন্য গৌরভের বিষয়। আপার শ্বশুরের অতিমাত্রায় সারল্য আমাকে সেদিন কাঁদিয়ে তুলেছিল।

আমরা সবাই মিলে আপাকে আনতে গিয়েছিলাম আপার শ্বশুরবাড়ি। খাশী জবাই হলো, বড় বড় মাছ তোলা হলো পুকুর থেকে। সারারাত জেগে মেয়েরা যেসব পিঠা বানিয়ে ছিল তা থরে থরে সাজানো হলো নক্সা করা চিনে মাটির বাসনে। আমাদের বসতে দেয়া হলো ফুলতোলা রঙিন চাদরের ওপর।আমাদের কি তখন বসে থাকার বয়স!

বুবু, তোর মনে আছে আমি আর তুই ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। আমাদের পরনে একই রঙের, একই প্রিন্টের ফ্রক। দেখতে দেখতে আমরা আপাদের রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেক কাজ তখনো বাকী। লোকজন নিয়ে আপার শাশুড়ী খুব ব্যস্ততার সাথে সব করছেন। আপাও কি যেন করছিলেন। এসময় আপার শ্বশুর কাজ-কর্মের তদারকী ভঙ্গিতে হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

আপাকে বললেন— 'এরা কি তোমার বোন?'

'জ্বী আব্বা।'

'তোমরা ক' বোন?' বলে উনি আঙুলের মাথায় গুনতে থাকলেন।

আপা হাসতে লাগলেন। কতোক্ষণ পর আপার শ্বশুর বলে উঠলেন—'এদের মধ্যে কোন্‌টা তোমার সৎ বোন?'

আপার মুখে হাসি মিলিয়ে গেলো। একটু চুপ থেকে আপা বললেন—'আমরা কেউ কাউকে সৎ ভাই বা সৎ বোন মনে করি না।'

'মনে না করলে ঠিক আছে, তবে তোমার সৎ বোন তো একটা আছে।'

আপা নীরব। কোনো উত্তর দিলেন না।

কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি তোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন—'এটা তোমার সৎ বোন?'

আপা মাথা নাড়লেন—'জ্বী-না।'

এবার আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলেন—'তাহলে এ নিশ্চয়ই তোমার সৎ বোন?'

আপা থতমত করে মাথা নেড়ে বোঝালেন—'হ্যাঁ।'

আমার সেদিন ভীষণ কান্না পেয়েছিল। আব্বা-আম্মা কেউ বিষয়টা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তবু মেনে নিতে হয়েছে কারণ তাঁরা জানতেন, আপার শ্বশুর বাজে লোক নন, অভদ্র নন। তিনি জেনে-বুঝে বোকামী করেন না। শুধু এই যে, আল্লাহপাক তাকে বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু কম দিয়েছিলেন।

আমি তো বাড়ি আসার পর পরই বড় আম্মাকে কেঁদে কেঁদে ঘটনাটা বলেছিলাম। বড় আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'আপনি কি আমার সৎমা?'

'না'—অকপটে উত্তর দিয়েছিল তিনি।

'তাহলে আম্মা কি সৎমা?'

www.pathagar.com

'না, কেউ তোমার সৎমা নয়। কারণ তোমার আম্মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, আর তোমার জন্মের পরে তোমার মা খুব অসুস্থ থাকায় তোমাকে আমি বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি আমি। তাহলে তুমি এখন কাকে সৎমা বলবে? সৎমা বলতে এ ঘরে কেউ নেই।'

সেদিন আমি ভেবেছিলাম-আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সবদিক থেকে সব কিছু দিয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্যসহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ভাগ্যের কারণে মানুষ অনেক কিছুই হয়তো পায়, কিন্তু ক'জন মানুষের ভাগ্যে এমন দু'জন মা জোটে? আমার চেয়ে সুখী মানুষ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। কিন্তু সুখ জিনিসটা এতো ক্ষণস্থায়ী, এতো অল্প সময়ের জন্য আসে তা দুঃখ আর বিষাদের ছায়া জীবনে নেমে আসার আগ পর্যন্ত আমিও বুঝতে পারিনি।

বিয়ের সাথে সাথে প্রথমে যে পদবী আমাকে দেয়া হলো, যে ভূষণে আমাকে ভূষিত করা হলো তা ছিল অপয়া। 'অপয়া' শব্দটি বইয়ে বহুবার পড়েছি। যার জন্য এ তিন অক্ষরের শব্দটি ব্যবহার করা হয় সে যে কতো দুঃখ পায়, কতো অপমান বোধ করে তা এর আগে বুঝিনি বা অনুভব করিনি। এ বিশেষণে আমাকে আখ্যায়িত করার একমাত্র কারণ ছিল, আমার যেদিন বিয়ে হয় সেদিন ওদের বাড়িতে একত্রে দু'টো বাচ্চা পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। মারা যায়নি একটিও, তবে পেটে প্রচুর পানি ঢোকাতে ক'দিন পর্যন্ত বাচ্চারা অসুস্থ থেকেছে।

বুবু, কি আশ্চর্য বল! আমি কি ওদের ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলেছিলাম? এমনও তো তারা ভাবতে পারতো যে, আমার ভাগ্যেই ওরা মরেনি। নতুবা মরেও তো যেতে পারতো!

কিন্তু তা ওরা ভাববে কেন! আমাদের দেশের লোকেরা তো শিখেছে শুধু খারাপ জিনিসগুলো অনুকরণ করতে। কবে কোথায় কোন বউ বাড়িতে পা রাখার সাথে সাথে গোয়ালের বড় গরুটা হাম্বা হাম্বা করতে করতে মরে গেলো, আর শাশুড়ী চিৎকার করে পাড়া জাগিয়ে বলতে থাকলো-'হা রাম, একি হলো! এ বউ যে অলক্ষ্মী, অপয়া গো!'

কিন্তু কিছু এমন ঘটনাও তো ঘটে, বউ আসে, শাশুড়ী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। চুল আচঁড়ে দেয়, শাড়ী পরিয়ে দেয়, হাতে নক্সা করে মেহেদী লাগিয়ে দেয়, মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে ঘুম পাড়ায় আর বলে-'তুমি বউ নও, তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার মা।'

এই যে ব্যবহার, এই যে সদাচার, এই যে সুশিক্ষার একটা দিক-যদিও এর নজীর খুব কম, তবু আমি বলবো-এটাও তো অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ কি তা করতে চায়? না তা করার চেষ্টা করে?

আসলে আমাদের সমাজে বউদের তো স্বামী বা শাশুড়ীর সংসারে আদর দেবার জন্য আনা হয় না, বা খাতির-তোয়াজ করার উদ্দেশ্যেও আনা হয় না। বউয়েরা তো আসে সংসারে প্রয়োজন মেটাতে। বউদের তো আনা হয় ঘরে কাজ করার জন্য।

তোর মনে নেই বুবু, ফজরীর মায়ের কথা তাগড়া জোয়ান মোটা সোটা মেয়ে লোকটি আমাদের উঠোনে বসে বলছিল-'কি করি মা, কাজ-কাম করতে পারি না। শরীরে বাত। তাই তো আহম্মদকে বিয়া করালাম। ঘরে কাজ করার মানুষ নাই।'

www.pathagar.com

তুই বলেছিস—'তাহলে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে তুমি ঘরে বউ আনোনি, কাজের মাতারী এনেছো?'

ফজরীর মা তেতে উঠে বলেছে—'আমি আর কয়দিন বাঁচমু। সংসারটা তো বউদেরই। তাদের সংসারে তারা কাজ করবে না তো কে করবে?'

হ্যাঁ, ফজরীর মা অন্যায় কিছু বলেনি। সংসারের বউ আসবে, নিজের সংসারে নিজে কাজ করবে তা সে নিজেকে ঘরের মালিক ভেবে করুক আর বাঁদী ভেবে, এটা তার নিজের ব্যাপার। কিন্তু এ সংসারকে কতোজন নিজের করে পায়? পেলেও তা কয়দিনের জন্য? কিছুদিন বউ থাকে চোরের মতো শাশুড়ীর দাপটের তলায়। আবার একটা সময় আসে, শাশুড়ী থাকে বেড়ালের মতো বউয়ের চামুচের তলায়।

স্বামীকেইবা ক'জন মেয়ে আপন করে পায়? স্বামীর সংসারকে নিজের সংসার বলে একে ফুলে-ফলে সাজিয়ে যখন সুন্দর করে তোলে, তখন অনেক সংসারেই দেখা যায় স্বামীর চোখে নতুন রং ধরে। অনায়াসে স্ত্রীকে বলে দেয়—'আমি যেমন ইচ্ছে চলবো, যখন ইচ্ছে ঘরে আসবো। সইতে পারো তো থাকো, নইলে আমার সংসার ছেড়ে চলে যাও।'

সংসারটা আসলে কার? বিয়ের আগে পুরুষটির তো কোনো সংসার ছিল না। বাপের ঘাড়ে অথবা মেসে থাকতো। বিয়ে করে স্ত্রীকে বহু ওয়াদা করে নিজের পাশে দাঁড় করিয়েছে। স্ত্রী আসার পর একটা ছোট ঘর বেঁধেছে দু'জনে মিলে। স্ত্রী এ ঘর, এ সংসারকে সাজিয়ে-গুছিয়ে শোভিত করেছে। স্ত্রী এ ঘরের রাণী, স্বামী হচ্ছে রাজা। শুধু রাজাই নয়-স্ত্রী'র বা এ সংসারের পাহারাদারও সে। কিন্তু এ পাহারাদাররা অনেক সময়ই তাদের ডিউটি সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। কেউ কেউ সর্বক্ষণ বউকে ডান্ডা নিয়ে ঠান্ডা রাখতে চান। কিছু সংখ্যাক তো জানেই না, তাদের ডিউটি আসলে কি বা কতোটুকু। আবার কেউবা তাদের ডিউটি পালনের ক্ষেত্রে এতো কঠোর হয়ে যান যে, স্ত্রী বেচারীর জন্য তখন ঐ সংসার কারাগারের মতো হয়ে যায়।

তোকে নিয়ে শুরু থেকে শেষতক ঘটনাটা কি হলো তাই একবার ভেবে দেখ্ না বুবু।

বিয়ের পর তো তোরা মুক্ত বিহঙ্গের মতো দু'জোড়া পাখা মেলে কিছুদিন একত্রে উড়েছিস। তোদের চেয়ে বেশী সুখী কে ছিল!'

তোকে ছেড়ে তোর বর যেন থাকতেই পারতো না। তোরা দু'জন সর্বক্ষণ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতি। আজ সিনেমায়, কাল পিকনিকে। বিকেলের মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াতে তোর বর খুব পছন্দ করতো–তাও তোকে নিয়ে। তোর কি মনে পড়ে, কতো শত ছবি কতো শত ভঙ্গিতে তুই তুলেছিস তোর বরের সাথে? কতোবার বাইরে খেয়েছিস তার সাথে?

তোদের মতো 'হ্যাপী কপাল' ক'টি ছিল আমাদের বাড়িতে? তুই কি মনে করিস তোদের সুখের দিনের যেসব গল্প তুই গর্বের সাথে আমাকে শুনিয়ে আনন্দ পেয়েছিস সে সব আমি ভুলে গেছি? না, আমি একটাও ভুলিনি। কারণ তোর সুখে যে আমিও সুখী ছিলাম।

www.pathagar.com

আমার তো সুখ ছিলই না। ভাবীদের কাছে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে জানিয়ে দিলাম—'আমি আর ও বাড়ি যাবো না। ওই লোকটা যেন এ বাড়ি আর না আসে। তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আব্বাকে তা জানিয়ে দিও।'

আব্বা বললেন–'ঠিক আছে। তোমার মন না চাইলে যেও না। তোমার মনের ওপর আমি জব্বরদস্তি চালাবো না।'

বাঁধ সাধলেন আম্মা। চোখ রাঙালেন, দাঁত কিড়মিড় করলেন—'হলোটা কি শুনি? কি দোষ তার! তার কিসের অভাব?'

মুশকিল তো ওখানেই। কিসের যে অভাব এটাই তো মুখ ফুটে বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা আমার দরকার তা তো না চেয়েই সামনে হাজির হতো। ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা কিসের অভাব ছিল তার? দু'হাতে টাকা-পয়সা লুটানোর মতো মনও তার ছিল। কিন্তু কিছু মানুষের এমন কিছু বাতিক বা এমন কিছু অভ্যাস থাকে যা অন্য মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া মানুষের মন জয় করার সব চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তার মন। একটি সুন্দর নিবেদিত মন। ঐশ্বর্যের গরিমা বা টাকার দম্ভ দেখিয়ে কারো মন কেনা যায় না। এটুকু ছোট্ট কথা আম্মা অবশ্যই বুঝতেন, কিন্তু তিনি যে বোঝেন তা আমাকে বুঝতে দিতেন না। আম্মা এ নিয়ে আমার সাথে রাগ করতেন। তার চিন্তা ছিল-'লোকে এ নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

আমি তাকে পছন্দ না করা বা তাকে বাঘ-ভাল্লুকের মত ভয় পাওয়া মানেই 'ছাড়াছাড়ি'। আম্মার যত আশংকা ছিল এই ছাড়াছাড়িটা নিয়েই। তার দৃষ্টিতে এটা ছিল বংশীয় মর্যাদার ওপর এক বিরাট আঘাত। আর এ আঘাত আসবে তারই স্নেহস্নাত কন্যার মাধ্যমে–এটা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

বড় আম্মা ছিলেন খুবই উদার। বলতেন—'মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন বকাঝকা করে কি লাভ! একটু বয়স বাড়ুক, সব কিছু যখন বুঝবে তখন আর কাউকে বলতে হবে না, নিজেই যাবে।'

যাবো কি, যতই দিন যেতে থাকলো আমার মন যেন বিদ্রোহী শক্তই হতে থাকলো। তার কাছে যেতে হবে ভাবলেই আমার দু'চোখের কোন বেয়ে বন্যা নামতো। ভাবলেই মনে হতো, এর চেয়ে আমাকে কেন কবর চাপা দেয়া হয় না, কেন জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়া হয় না? মনে হতো, জংগলেও আমি বাঘের বা সিংহের শিকার হবো, হয়তোবা ভয়ানক এক অজগর এসে আমায় পেঁচিয়ে ধরবে। কিন্তু সে তো বারবার নয়–মাত্র একবার।

এ সময়ে তুই এলি 'বউ বউ' ভাব নিয়ে তোর বরের সাথে বমি করতে করতে। সারা বাড়িতে খুশীর জোয়ার। তোর বর তোকে বই কিনে দিলো, আরো কতো দামী দামী ওষুধ-পত্র, খাবার-দাবার। সবাইকে লুকিয়ে তুই আমাকে তোর বইটা পড়তে দিয়ে বলেছিস্—'দেখ পড়ে, দ্যাখ না কি সব ছাইপাশ আঁকা রয়েছে বইয়ে।'

বরের দেয়া 'যারা মা হবে' বইটা পড়ে তুই অনেক প্রশংসা করেছিস। প্রশংসা করেছিস বইটার নয়, তোর বরের। 'দেখেছিস তোর দুলাভাই কতো দিকে খেয়াল রাখে! সে ঠিকই জানে আমার কখন কি দরকার।'

www.pathagar.com

এরপর তোর ছেলে হয়েছে। ছেলে হবার পরদিনই তোর বরের প্রমোশন হয়েছে। সরকারী বাড়ী পেয়েছে। এরপর থেকে তো তোর সৌভাগ্যের গোলা হীরে-পান্নায় আরো ঝলমলিয়ে উঠলো।

তুই বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলি। বরের দিকে খেয়াল ছিল না, নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে নজর ছিল না–এমনকি ছিল না সাজগোজের জন্য কিছু সময়। ছেলেকে পেয়ে তুই যেন ভুলে গেলি সব কিছু ।

এটা কিন্তু তোর মোটেই ঠিক হয়নি বুবু। যার যার পাওনা তাকে ঠিকঠাকমতো বুঝিয়ে দিতে না পারলেই যে ভুল বুঝাবুঝি বাড়ে, বদলে যায় পৃথিবী। বদলে যায় জীবনের সবচেয়ে আপন মানুষটিও।

তোকে তো খুশু আর নুশুর ঘটনা বলাই হয়নি।

খুশু নামের যে ছোট্ট মেয়েটি আমাদের স্কুলে পড়তে আসতো তাকে তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। ওই যে বকাউল বাড়ির মনু মাষ্টারের মেয়ে খুশু। খুশুর সাথে বকাউল বাড়ি থেকে আরো ক'টি মেয়ে আসতো। আসতো খুশুর চাচাতো বোন নুশু। নুশু পড়তো খুশুর এক ক্লাস নীচে।

খুশু ছিল হালকা-পাতলা, নুশু নাদুস-নুদুস। খুশুর বিয়ে হলো। ঘর ভালো, বরও ভালো। খুশুর মতো শান্ত-শিষ্ট মেয়ে যেকোনো ঘরকে জান্নাতের বাগিচা বানাতে পারে।

খুশুর প্রশংসায় শ্বশুর-শাশুড়ী পঞ্চমুখ। ওর বরের আর কোনো ভাই ছিল না বলে শাশুড়ী অতিরিক্ত ভালোবাসতো তাকে। খুশুর ভাগ্য দেখে সবাই বলেছে–'একেই বলে সৌভাগ্য।'

কিন্তু বই যারা পড়েন তারা শেষের পাতা না পড়া পর্যন্ত ঘটনার শেষ অংশ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারেন না–তাই বলে বইয়ের লেখকের কাছে তো কিছুই গোপন থাকে না। খুশুর জীবন-কাহিনী যিনি লিখে রেখেছিল তিনি তো আগে থেকেই জানতেন, খুশুর খুশী একেবারেই অল্প সময়ের জন্য।

খুশু মা হবে শুনে শাশুড়ী তো চওথা আসমানে। তার একমাত্র ছেলে বাবা হয়ে যাচ্ছে, তিনি দাদী হবেন, এ খুশী তিনি রাখবেন কোথায়! খুশুকে কাজ করতে দেন না, শুইয়ে রাখেন।

একদিন মনু মাষ্টার গেলেন মেয়েকে আনতে। শাশুড়ী বললেন–'বিয়াই সাব, আমি তো চাই বউমাকে আমার কাছেই রাখতে।'

মনু মাষ্টার বলেন—'থাকবে তো আপনার কাছেই, আমি মাত্র কয়েকটা দিন রাখবো। ওর মা বলছিল, এ সময়ে জামাইসহ গিয়ে ক'টা দিন বেড়িয়ে আসতে।'

বরসহ খুশু এলো বাবার সাথে বাবার বাড়ি বেড়াতে। বর বাবা হবে, এ খুশীতে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করলো বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। অনুষ্ঠানের সব

www.pathagar.com

মাতব্বরী আর তদারকী করলো নুসু। তাজা ফুলের মালা বানিয়ে বরের গলায় পরিয়ে দেবে ছোট্ট দু'টো মেয়ে গান গেয়ে। মেয়েরা গায়—

'ক্ষুদ্র মোদের গৃহে তোমায় কেমনে ডাকিয়া আনি?
বিরাট অতিথি তুমি যে মোদের অন্তরে অন্তরে জানি।"

নুশু আড়াল থেকে শাসায়-'বোকা চন্ডুগুলোকে কতো করে শেখালাম—অতিথী, ফের বলে অতিথি।'

খুশুর বর হেসে বলে—'তা আড়াল থেকে কেন'? অতিথীর সামনে আসতে এতো লজ্জা কিসের'?'

খুশু সায় দিয়ে বলে-'হ্যাঁ তাই তো। তোরা আড়ালে লুকিয়ে থাকলে ও কার সাথে কথা বলবে'? সবখানে দেখি শালীরা কতো হাসি-তামাসা করে দুলাভাই'র সাথে। আর তোদের যতো ঢং।'

খুশুর বর হেসে বলে—'অর্ধেক তো দেখেই ফেলেছি, এখন সামনে এলে আর অসুবিধে হবে না।'

খুশু ডাকে—'নুশু! এ্যাই নুশু, এদিকে আয়।'

নুশু আসে না, নুশুর হাসির আওয়াজ আসে। খুশু উঠে গিয়ে নুশুকে টেনে তার বরের সামনে এনে বলে–'দেখো কি লাজুক লতা!'

খুশুর বর ঘাড় কাত করে নুশুকে দেখে নিয়ে বলে-'ওরে বাবা, এতো একেবারে খানদানী চেহারা।'

বরের কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। তবে চেহারা যে খানদানী সে কথা মিথ্যে নয়। দুলাভাই'র সাথে গাল-গল্প হাসি-ঠাট্টা করতে করতে নুশুর দ্বন্দ্ব কেটে গেলো।

খুশুর শরীর অসুস্থ। কখনো বমি করে, কখনো মাথা ধরা বা মাথা ঘুরাচ্ছে বলে শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে ঘুমায়। নুশু বসে বসে খুশুর বরকে সঙ্গ দেয়, হাসে, হাসায়, গল্প করে, খেতে দেয়।

খুশুর শরীরটা একটু বেশী খারাপ হাওয়াতে খুশু মায়ের কাছেই থেকে যায়। এ উসিলায় বর দু'একদিন পরপরই আসতে থাকে। তবে তার সম্পর্ক এখন খুশুর চেয়ে নুশুর সাথেই বেশী।

একদিন ভোরবেলা উঠে নুশুর মা নুশুকে ডাকতে থাকে। কোথায় নুশু, সারা বাড়ি খুঁজে তাকে পাওয়া গেলো না। পাওয়া গেলো না খুশুর বরকেও।

একমাস পর চিঠি এলো। চিঠি এলো খুশুর শাশুড়ীর নামে। ছেলে লিখেছে তাকে। সে নুশুকে নিয়ে শহরে আছে। নতুন বিবাহিতা স্ত্রী নুশরাত ওরফে নুশুর জন্য মা যেন দোয়া খায়ের করেন। কারণ নুশু মা হতে চলেছে।

খুশু আর যায়নি শ্বশুরবাড়ি। খুশু মা হয়েছে, একটা মেয়ে হয়েছে খুশুর। বাবার বাড়ি থেকে মেয়েটাকে বড় করেছে। মেয়েটার এখন বিয়ের বয়স। মেয়ে নাকি বলেছে—'আমার যদি বিয়ে হয় তাহলে মায়ের পরিচয় নিয়ে হবে, বাবার নামে নয়।

www.pathagar.com

একটা লম্পট, ধোঁকাবাজ দুশ্চরিত্র বাবার পরিচয় দেবার চেয়ে একজন মহিয়ষী মায়ের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা আমি সার্থক মনে করি।'

সাহস আছে বলতে হবে, সাহস আছে মেয়েটির। খুশু সার্থক মা হয়েছে, সার্থক স্ত্রী হতে পারেনি। নিজের সম্পদের প্রতি তার খেয়াল ছিল না। সম্পদের ব্যবহার বা বন্টনে সে ঠিক ওই ভুলই করেছে–যা তুই করেছিস্—এটা আমার মতামত নয়, মতামত বাড়ির বুড়া-বুড়িদের। তুই হয়তো এ ব্যাপারে একমত হবি না,-একমত হবে না হয়তোবা আরো অনেকেই। অবশ্য বিভিন্নজনের বিভিন্ন মত থাকাই স্বাভাবিক। এটা তো জরুরী নয় যে, সবাইকে সব ব্যাপারেই একমত হতে হবে!

আমার ব্যাপারেই কি সবাই একমত ছিল? বেশীর ভাগ লোকই তো বলেছে 'জামাই নম্র, ভদ্র। জামাই দিলওয়ালা, পয়সাওয়ালা। জামাই দেখতে-শুনতে দশজনের মধ্যে এক জন। সাত গেরাম খুঁজে এমন জামাই পাওয়া যাবে না।'

আবার কেউ কেউ একথাও বলেছে—'জামাই তো নয় যেন পাহাড়। এ যেন বাঘে আর ছাগে।'

তোর বরই তো বলেছে-'মাই গড! তার জুতো দেখে আমি সারপ্রাইজড হয়ে গেছি। এ যেন আরব সাগরের শীপ, ছোট-খাট দু'টো জাহাজ।'

তার জুতো জাহাজের মতো হোক আর সাইকেলের মতো আমার তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। তার কতোটুকু ভদ্রতা জ্ঞান আছে তাও কোনো বিষয় নয়। সামাজিক মূল্যবোধ তার কতোটুকু আছে, মানুষের সাথে চলনে-বলনে, আচার-আচরণে কতোটুকু সে সচেতন–এসবও আমার মায়ের দৃষ্টিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে ধর্তব্য ছিল না। আম্মা সবসময় আমাকে শাসাতেন, আমাকে রাগতেন, চোখ রাঙাতেন। ধমকিয়ে বলতেন-'তুমি কি বোঝ দুনিয়ার? দুনিয়াতে ক'টা পুরুষ দেখতে সুন্দর। পুরুষদের সৌন্দর্য লাগে না, তাদের পৌরুষ থাকলেই হয়।'

মুখে, ঠোঁটের পাশে জবাব এসে ফিরে যেতো। ভয়ে কিছু বলতে পারতাম না। বলতে চাইতাম-'আমার বাবার তো সৌন্দর্যও আছে, ব্যক্তিত্বও আছে।'

বলতে চাইতাম-'তুমি স্বার্থপর আম্মা। তুমি সব পেয়েছো, তাই আমার দুঃখ, আমার বেদনা তুমি অনুভব করতে পারছো না।'

বলতে পারিনি কখনো, কিন্তু বহুবার বলতে চেয়েছি। আম্মার ওপর আমার ভীষণ রাগ হতো। মা হয়ে দুশমনের মতো ব্যবহার। মা হয়ে মেয়ের ঘা দেখতে পারছে না, রক্তের হিস্যা যাকে দিয়েছে তার ব্যথা অনুভ করতে পারছে না। মনে হতো আম্মা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

আজ মা নেই। আজ বড় হয়েছি। আজ সব বুঝি। আমি যখন যা চাইতাম তাই পেতাম। যখন যা বলতাম তাই সবাই করতো। আব্বা ও বড় আম্মার অতিরিক্ত আদরে আমি বলতে গেলে একটু বেশীই ন্যাকামী করতাম–যেটা আম্মা পছন্দ করতেন না। আম্মা চেয়েছিলেন, আমি পড়াশোনা করে অনেক জ্ঞানী হই, আমি সর্বগুণে গুনান্বিত হই, হই নিষ্কলংক।

www.pathagar.com

আব্বা ও বড় আম্মার আদরের সাথে আম্মার কঠোর শাসন না থাকলে আজ আমি কি হিসেবে সমাজে আখ্যা পেতাম জানি না। আজ আম্মার জন্য আমি দোয়া করি, প্রাণভরে দোয়া করি। দোয়া করি, দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালা! আমার মায়ের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন।

আসলে মা তো কোনোদিনই সন্তানের সাথে স্বার্থপরতা দেখান না। তার সমস্ত স্বার্থই তো থাকে সন্তানের সাথে জড়িত। সন্তানের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্যের সাথে জড়িত। এ ছোট কথাটুকু সে সময়ে আমি বুঝতে পারিনি। মায়ের নির্দেশগুলোকে আমার মনে হতো সমন, পরোয়ানা। মায়ের ব্যবহার মনে হতো ক্ষমাহীন। আমি যাকে চাই না, যাকে মনে করি একটা রাক্ষস আর মা হয়ে তিনি তাকে খাতির-তোয়াজ করেন। বাবা! বাবা! করে হেসে হেসে তার সাথে কথা বলেন, যখন তখন খবর পাঠিয়ে আম্মা তাকে ডেকে আনেন। আমি তখন পালিয়ে যাই। ভাবীর ঘরে, বড় মায়ের বিছানায়, চাচীর পাশে।

সচরাচর আমি ঘুমুতাম আম্মার বিছানায়, আম্মার পাশে। সে রাতেও ঘুমিয়েছিলাম। রোজার মাস। সারাদিন রোজা রেখে ইফতার, ইফতার শেষে মাগরীব, মাগরীবের পর পেট ভরে এক গাদা খাবার গেলা। এরপর এশা ও তারাবীহ্।

এই 'তারাবীহ্' আমরা আবার কখনো একা একা পড়তাম না। চাঁদনী রাত হলে উঠোনে পাটি বিছিয়ে মা, চাচী, ভাবীরা, কাজের মেয়েরা সবাই মিলে দাঁড়িয়ে যেতাম। বিশ রাকাত নামায আমরা বেশ রয়ে সয়ে পড়তাম। কি যে আনন্দ হতো। চার রাকাত পড়ে মোনাজাত শেষ করেই শুরু হতো ছোলা-মুড়ি খাওয়া। আবার কুলিটুলি করে চার কি আট রাকাত পড়ে মোনাজাত দিয়েই গুড়মুড়ি অথবা ঘি-মুড়ি কখনোবা সেমাই। এভাবেই আমাদের তারাবী শেষ হতো।

সে রাতেও নামায শেষে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহটা আম্মার বিছানায় এলিয়ে দিতেই জান্নাতের হুরপরীরা যেন আমায় আদর দিতে দিতে ঘুমের দেশে নিয়ে গেল। মধ্যরাতে হঠাৎ কিসের এক প্রচন্ড আঘাতে জেগে উঠলাম। মনে হলো কে যেন ঘুমের দেশ থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে নীচে ফেলে দিচ্ছে। আমি ভয়ে চিৎকার করে চোখ মেলে তাকাতে চাইলাম, একটা ভারী হাত আমার মুখে থাপ্পরের মতো এসে আমার আওয়াজ বন্ধ করে দিলো। অনেক ধাক্কাধাক্কি, ঝাপটাঝাপটি করে আমি খাট থেকে দড়াম করে নীচে পড়লাম। পেঁচানো অজগরকে ছুঁড়ে ফেলে যদিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার বিষদাঁত থেকে নিজের শরীরকে আমি অক্ষত রাখতে পারিনি।

সত্যি বলতে কি বুবু, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন! সেদিনের সে ব্যবহারের জন্য আম্মাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। আজো তা মনে পড়লে চিৎকার দিয়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। আম্মা কি করে তা পেরেছিল? আমি তো মায়ের পাশেই শুয়েছিলাম, এর চেয়ে নিরাপদ-নির্ভরযোগ্য জায়গা আর কি হতে পারে! আমি কি জানতাম, রাত বারোটার লঞ্চে সে আসবে, আর আমাকে বাঘের মুখে ফেলে রেখে অতি সন্তর্পণে আম্মা সরে পড়বেন নিজের বিছানা থেকে!

www.pathagar.com

রাগে-ক্ষোভে ও দুঃখে-বেদনায় আম্মার সাথে ক'দিন যে কথা বলিনি আজ তা মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, আম্মার তাতে কোনো দুঃখ ছিল না। এর দু'মাস পর যখন সবাই দেখলো আমি কোনো খাবারই মুখের কাছে নিতে পারি না, সব খাবারেই দুর্গন্ধ লাগে। শুধুমাত্র কাঁচা আম লবণ-মরিচ মেখে খাচ্ছি তখন সারা বাড়ি জুড়ে কি আনন্দ! আম্মা তো যেন মহাকাশ জয় করে ফেলেছেন-কি হাসি, কি খুশী! আমার কি আদর! এখন আর আম্মা আমার সাথে রাগ করেন না, আমার মতের বাইরে কিছু করেন না। আম্মার সাথেই বরং এখন আমি অতি সহজে রাগ করি, বেয়াদব-বেশরমের মতো কথা বলি। আম্মা কি সহজভাবে হাসেন। বড় আম্মার সাথে বলেন-'আমি তো এটকুই চেয়েছিলাম। যে করেই হোক, কোনোমতে একটা বাচ্চা কোলে এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বুবু তুই তা জানিস, ভয়; শংকা, দ্বিধা আর সংকোচে আমি কতো বিষন্ন হয়ে পড়েছিলাম। দিনরাত বসে বসে কবিতা লিখতাম আর ছিঁড়ে ফেলতাম।

লিখতাম কচিকাঁচার আসরে, মুকুলের মাহফিলে, শাহিনের মাহফিলে। এসব পাতার সদস্যদের ঠিকানা টুকে নিতাম। আমার নাম-ঠিকানা যারা পত্রিকায় পড়তো তারাও আবার আমাকে লিখতো। সারাদিন পত্রিকা নিয়ে বসে থাকতাম। ছোটদের আসরের অগণিত কলম বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতাম। শত শত চিঠি আসতো আমার নামে।

আম্মা বলতেন—'মেয়ে যে দেখছি দিনদিন মশহুর হয়ে যাচ্ছে। এরপর তো আলাদা একটা পোষ্ট অফিস দরকার হবে তার জন্য।'

আব্বা বলতেন—'লিখুক, লিখতে দাও। কিছু একটা নিয়ে তো তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

আম্মা বলতেন—'এতো চিঠিপত্র আসে কোত্থেকে?'

'সে যে পরিমাণ চিঠি প্রতিদিন ছাড়ে সে পরিমাণই উত্তরও আসে।'

আব্বা আমায় বলছিলেন—'এভাবে এই যে এতো চিঠিপত্র আসে রোজ-রোজ, তোমার পড়তে ভালো লাগে?'

আমি নির্ভয় আব্বাকে বলেছি–'আমার এতে সময় কাটে।'

আব্বা হেসে বলেছেন—'তা আমি জানি, নতুবা তুমি তো আর এদেরকে তেমন চেনো না। কোথায় রংপুরের গাইবান্দা-সৈয়দপুর, মোমেনশাহীর জামালপুর, সিলেটের সুনামগঞ্জ, কোথায় সেই ফরিদপুরের মাদারীপুর, কোথায় খুলনার সাতক্ষীরা, যশোরের ঝিনেদা, বরিশালের ঝালকাঠি আর কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা। এদের চিঠি পড়ে তুমি আনন্দ পাও বলেই তুমি তাদের লেখো, তারাও লেখে।'

আমার কাছে যেসব চিঠি আসতো সেগুলো আমি খুশী হয়ে আব্বাকে দেখাতাম। আব্বাও বাড়ীর সবাইকে বেশ গর্বের সাথে বলতেন–'দেখো, অমুক লীডারের চিঠি এসেছে আজ আমার মেয়ের কাছে, অমুক রাইটারের চিঠি এসেছে, অমুক সাংবাদিকের চিঠি এসেছে।'

www.pathagar.com

তুই তো বুবু তখন আমাদের বাড়ীতেই ছিলি–যখন চিঠি এসেছিল ঢাকা থেকে কবি জসিম উদ্দীনের। এর দু'দিন পরেই আসলো কবি সুফিয়া কামালের চিঠি। কতো সুন্দর করেই না তাঁরা আমাকে চিঠি লিখেছিলেন।

সুফিয়া কামালের চিঠির ভাষা আমার আজো মনে আছে। মনে আছে চিঠিতে উল্লেখিত দু'টো মূল্যবান উক্তি–'তুমি হতাশ হইও না। একদিন আমি তোমার চেয়েও বেশী বিপদে পড়েছিলাম। আল্লাহ তোমার একটা পথ এবং ভালো পথই করে দেবেন। আমি আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হইনি, তুমিও হবে না।'

ঢাকায় বড় বড় লেখক, সাংবাদিক ছাড়াও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমি নিয়মিত চিঠি লিখতাম। এটা যেন আমার হবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলামী দলের যারা নেতা ছিলেন তাঁদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সবসময় চিঠি লিখতাম, নানান প্রশ্ন করতাম। একবার একজন প্রখ্যাত নেতাকে আমি এ প্রশ্নও করেছিলাম—'একটা মেয়ে যদি তার স্বামীকে পছন্দ না করে তাহলেও কি তাকে সে স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকতে হবে? বংশীয় মর্যাদার দোহাই দিয়ে কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট করা বা তাকে তার অপছন্দনীয় স্বামীর ঘর করতে বাধ্য করা কি ইসলাম সমর্থন করে বা করা কি ইসলামী আইন সঙ্গত?'

আমার এ প্রশ্নের জবাব এসেছিল শুধু আমার কাছে নয়–খবরের কাগজের পাতায় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে। আব্বা দেখে তেমন কোনো মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছিলেন–'আমি যা পারছিনে, পারলে তুমি তা করে নিও। আমি জানি তোমার জীবনটা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।'

জীবনকে আমার মনে হতো কারাগারের মতো নিরানন্দ-বিষাদময়! প্রতিদিন লাইব্রেরী থেকে বই আনতাম। সকালে বই আনলে বিকেলেই পড়া শেষ হয়ে যেতো। বই পড়তে পড়তে গল্পের নায়িকার দুঃখ থাকলে তার সাথে মিশে যেতাম নিজে। মাঝে মাঝে মনে হতো চলে যাই কোথাও দূরে, জনপদ, লোকালয় ছেড়ে বহুদুরে যেখানে কেউ আমায় চিনবে না, দেখবে না, জানবে না আমার বেদনার্ত জীবনের হাহাকার! শুনবে না আমার ব্যর্থ ও পরাজিত আত্মার আর্তনাদ!

আমার জীবনে ছিল না কোনো আকাংখিত রাত, ছিল না কোনো সুন্দর সকাল, ছিল না কোনো মায়াময় বিকেল,ছিল না কোনো প্রত্যাশিত সন্ধ্যা। আমি তো জীবনের পাতা উল্টে যেতাম আমার প্রয়োজনে নয়, বাঁচার তাগিদে নয়, আমার মালিক যিনি আমাকে বানিয়েছেন এবং এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তিনি ডেকে নিচ্ছেন না বলেই।

জীবনে যতো ব্যথা-বেদনা, যাতনা-লাঞ্ছনা আর হতাশাই থাক না কেন, যখন বুঝতে পারলাম, কোনো একজনকে দুনিয়াতে পাঠানোর জন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত করেছেন তখন চরম নৈরাশ্যের মাঝেও যেন কিছু আশার আলো খুঁজে পেলাম।

ভাবতে বেশ ভালো লাগতো, একটা ফুলের মতো ফুটফুটে ছোট্ট মানুষ আসবে। তাকে নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকবো, তাকে সাজাবো, তাকে সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের কাপড়

www.pathagar.com

বানিয়ে দেবো। এরপর একদিন সে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। অনেক ভালো মানুষ বানাবো তাকে আমি। আমার হৃদয়ের সমস্ত নির্যাস ঢেলে তাকে বুকের মানিক করে রাখবো। আমি যা পারিনি, আমাকে দিয়ে যা হয়নি আমার সেসব আকাংখার বাস্তবায়ন ও স্বপ্ন তাকে দিয়ে বাস্তবায়িত করবো। ভাবতে ভাবতে আমি যেন আর অপেক্ষা করতে পারতাম না।

আমাকে তো সে সময়ে 'যারা মা হবে' বই কিনে দেবার মতো কেউ ছিল না, তাই তোর কাছ থেকে নিয়ে যা যা পড়েছিলাম, যতোটুকু মনে রেখেছিলাম–তাই পালন করতে চেষ্টা করতাম।

যার প্রত্যাশায় আমার দিন-রাত কাটতো না, অবশেষে আমার সেই একান্ত প্রতীক্ষিত, একান্ত আকাংখিত মেহমান এক ঘুঘু ডাকা ক্লান্ত দুপুরে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলো। আমি আমার শ্রান্ত-অবসন্ন হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বুকের সাথে মেলালাম। সে-ও বড় বড় বড় চোখের কালো পাঁপড়ি মেলে আমার দিকে তাকালো। আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম! আমি যেন বেঁচে থাকার একটি অবলম্বন খুঁজে পেলাম।

ছোট ভাইয়া খুশীতে লাফিয়ে উঠলো। বড় আম্মা আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আম্মা খুশীতে ভাষা হারিয়ে ফেললেন। আব্বা সিজদা থেকে মাথা তুলে বললেন-'আল হামদুল্লিাহ!'

মিষ্টি কিনে ঘরে ঘরে বিলানো হলো। আব্বা ছোট ভাইয়াকে পাঠিয়ে দিলেন মিষ্টির হাড়িসহ তাদের–বাড়ি সুখবরটি শোনানোর জন্য।

ফিরে এসে ভাইয়া বললো—'তারা কেউ তেমন আগ্রহ দেখায়নি বা খুশী হয়নি। তারা বললো-ও, মেয়ে হয়েছে! আমরা তো ভেবেছিলাম একটা ছেলে হবে।'

আব্বা বললেন–'বাদ দাও। আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট না হলে এটা তাদের ব্যাপার। এ খবরে তারা খুশী না হলে আমাদের কিছুই আসে যায় না।'

আশ্চর্য কথা! তাদের খুশীর জন্য আমি কোন্ মায়ের ছেলে চুরি করতে যাবো, বল বুবু? তাছাড়া আমার কাছে তো ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমার শুধু একটি বাচ্চাই দরকার ছিল–তা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। মেয়ে হয়ে বরং ভালোই হয়েছে। মেয়েরা মায়ের দুঃখ বোঝে। মায়ের কাছে বন্ধুর মতো সব কথা বলা যায়। আমাদের নবীর তো ছেলে ছিল না, তাতে কি তাঁর দুঃখ ছিল? তাঁর মেয়েরা কি কোনো অংশে অপাংক্তেয় ছিল? সাহাবী আমীর মোয়াবিয়ার তো ছেলেই হয়েছিল। শত শত বছর ধরে শত শত ছেলে জন্ম নিলেও কি এক ফাতেমার সমান হবে?

ভাবলাম, আমার মেয়ে হিসেবে আমি ওর নাম ফাতেমা রাখবো। আম্মা বললেন–'পাগলের কথা শোন। বাড়ী ভর্তি এ নাম। তোর বোনের মেয়ের নাম ফাতেমা, ভাই'র মেয়ের নাম ফাতেমা, চাচাতো বোনের নাম ফাতেমা। ওই একই নাম একটা সংসারে কতো জনের আর রাখবো!'

ছোট ভাইয়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললো–'আমি ওর নাম রেখে ফেলেছি। ওর নাম হবে পহেলী।'

www.pathagar.com

'পহেলী মানে তো প্রথমা। এটা একটা নাম হলো? বোকার মত কথা!'

ভাইয়া মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো–'এগুলো মডার্ণ নাম, আজকাল এসব নামই লোকেরা রাখে।'

'লোকে কি করে তাই দেখো আর শেখো। ভালো-মন্দ আর যাচাই-বাছাই করতে হবে না! ওসব ফালতু কথা রাখো। আমি হাদীস-কোরআন দেখে মুসলমানী নাম রাখবো, ঐতিহাসিক নাম! নামটা একটা ফেলনা কিছু নয়। নামে বংশের পরিচয় পাওয়া যায়, পরিচয় পাওয়া যায় জাতির।'

নাম অবশ্য আব্বাই রাখলেন পড়াশুনা করে। তবে ভাইয়ার রাখা নামটাও বাদ গেলো না, কারণ তোরা সবাই 'পহেলী' নামটা পছন্দ করেছিলি।

'পহেলী'র জন্মের পর আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেলো। নানান রোগ দেখা দিলো। বুকের প্রচন্ড ব্যথায় আমি কুঁকড়ে থাকতাম সারাক্ষণ। এক পর্যায় আমার বা হাত অবশ হয়ে গেলো। আমি চুল বাঁধতে পারতাম না। কাপড় ছেড়ে পরতে পারতাম না। একান্ত নিজস্ব কাজগুলো করাও আমার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়লো। 'পহেলী'র দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কোলে নিতে পারতাম না। বড় আম্মা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন আমাকে নিয়ে। স্কুল থেকে ফিরে এসে আম্মাও কিছু কিছু করতেন। তবে বড় আম্মা কিছুই আম্মার জন্য বাকী রাখতেন না। আয়শা পহেলীর দেখাশুনা করতো বলে 'পহেলীকে' নিয়ে কারোই চিন্তা ছিল না।

তুই তখন ঢাকায়, তবে তোকে ঘটনাটা সকলেই বলেছিল। তোর হয়তো তা মনে নেই।

এক মহিলা যাচ্ছিল বড় রাস্তা দিয়ে মাথায় একটা বোচকা নিয়ে কোমরে এক অদ্ভুত ধরনের ঢেউ তুলে। আমাদের বাড়ীর সামনে এসেই হাঁক মেরে গেয়ে উঠলো—'শিংগা লাগাবোনি... শিংগা? আছে কারো বাতের রোগ? হাতের বিষ, দাঁতের বিষ, মাজায় বিষ, পাছায় বিষ আছে কারো?'

কে যে তাকে ভেতর বাড়ীতে ডেকে এনেছিল তা আমার মনে নেই। মহিলার হাতে গোছাভরা কাঁচের চুড়ি, কানে বড় বড় ঝুমকা। পেঁচিয়ে শাড়ী পরেছে, চুলের খোঁপা বেঁধেছে বেশ উঁচু করে মাথার তালুর কাছাকাছি।

আমাকে দেখেই বললো–'মেয়ের হাতে বিষ বাত। পচা রক্ত জমা হয়েছে হাতে। এ পচা রক্ত বের করে ফেললে হাত ঠিক হয়ে যাবে।'

আমাকে বসিয়ে দু'জন দু'দিকে ধরে রাখলো। হাতের বাজুর ওপরে শক্ত করে বাঁধলো। এরপর বোতলের ভাঙ্গা একটা ধারালো টুকরো দিয়ে আমার হাতে ফুঁড়তে থাকলো আশ্চর্যবোধক (!) চিহ্নের আকারে। টপটপ করে রক্ত বেরুতে থাকলো, কালো রক্ত।

মহিলা গর্বের হাসি হেসে বলতে থাকলো–'দেখেছেন, কি বিষ জমে আছে? কি কালো কয়লার মতো রং! এই রকম রক্ত পচে বিষের মতো জমে আছে, তার হাত অবশ হবে না!'

মহিলা আরো যেন কি কি বলছিল, তার বাকী কথা আমার কানে যায়নি। আমি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েছিলাম জগী খালার কোলে।

www.pathagar.com

বিকেলে আব্বা ফিরলেন কুমিল্লা থেকে। রাগে-ক্ষোভে, দুঃখে-আফসোসে তিনি চিৎকার করে বাড়ী ফাটিয়ে তুললেন–'কোন্ জানোয়ারের মাথায় এ বুদ্ধি ঢুকেছিল? কে বাড়ীতে ডেকেছিল শিংগাওয়ালীকে? কতো বড় সাহস তার, যে আমার মেয়ের রক্ত চুষে বের করে! বাড়ীতে মানুষ ছিল না? পশুগুলো আর কাউকে পেলো না?'

আব্বা তক্ষুনি তৈরী হলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। পুরো একমাস থাকতে হলো আমাকে সেখানে।

তুই জানিস বুবু, ওই শিংগাওয়ালীর কথা? আমি কিন্তু আজো ভুলিনি। ধুমসী মাতারীকে পেলে হতো একবার। আমার গায়ে ফুটো করে! আমি তার শরীরের সমস্ত ফুটোয় 'সুপার গ্লু' ঢেলে বন্ধ করে দিতাম।

সে নিশ্চয়ই মরেনি। আর মরলেও তাদের দলের তো অভাব নেই। বাংলার আনাচে কানাচে এখনো শত শত শিংগাওয়ালীরা কোমরে নৃত্য তুলে ঘুরে বেড়ায়। মহিলাদের কোমরে শিংগা লাগায়-অর্থাৎ রক্ত চুষে বের করে আনে। শরীরের যেখানে যেখানে ব্যথা সেখানে সেখানে শিংগা লাগায়। এদের হাত থেকে কে বাংলার মা-বোনদের রক্ষা করবে?

ছোট ভাইয়াও ভীষণ রাগ করেছিল। বলেছিল–'শালার শিংগাওয়ালী, আসুক আবার এ বাড়ী! তার শিংগা তার গলায় ঢুকিয়ে দেবো।'

আসলে তাকে রাগ করে কি লাভ? এটা তো তার বেঁচে থাকার একটা মাত্র পথ। রোজগারের একমাত্র উপায়। আর কোনো যোগ্যতা তার নেই। এটাই সে জানে, এটাই শিখেছে। তাকে তো লেখাপড়া কেউ শেখায়নি। লেখাপড়া জানলে, বাঁচার জন্য কোনো সম্মানজনক পথ জানা থাকলে সে একাজ করতো না। তার ছেলে-মেয়েদেরও একাজ শেখাতো না।

আমাদের গ্রামগুলোতে সাধারণতঃ ভালো কোনো ডাক্তার থাকে না, যে কারণে গ্রামের সরল-সোজা, নিরীহ মানুষগুলো অনেক ক্ষেত্রে ভালো চিকিৎসার অভাবে বিভিন্ন রকম রোগে ভুগতে থাকে। অনেকের আবার ডাক্তারের ফী দেয়ার মতো বা ঔষধ কোনোর মতো সামর্থও থাকে না। বাধ্য হয়েই তারা খুঁজতে থাকে ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, শিংগাওয়ালীদের। খুঁজতে থাকে কোথায় কে তাবিজ দেয়, কে পানি পড়া দেয়, কে ঝাঁড়-ফুঁক করে। খুঁজতে থাকে—'আয় বেরিয়ে আয়, তোর মারে পুঁতিলাম, আয় বেরিয়ে আয় তোর মারে গাড়িলাম' বলে বলে কে দাঁতের পোকা বের করে।

অনেকে তো আবার এভাবে মারাও যায়। একজনের হয়তো হলো মৃগীরোগ, ওঝা এসে বলবে-'জ্বিনের আছর।' জ্বিন তাড়ানোর জন্য হয়তোবা মেটে পানিতে কয়লার আগুন ফুঁকিয়ে তাতে ধূপ ছিটিয়ে সেই ধোঁয়ার সামনে রুগীকে বসিয়ে রাখবে ওপরে কাঁথা বা কম্বল ঢাকা দিয়ে। রুগী যখন ঘামতে ঘামতে বেহুস হয়ে পড়বে তখন তাকে ঝাঁটা দিয়ে পেটাতে থাকবে। এ করতে করতে বেচারী হয়তোবা মরেই গেলো। ওঝা তখন বলবে–'তাকে জ্বিনে নিয়ে গেছে।'

আশ্চর্য! লোকেরা অনায়াসে তা বিশ্বাসও করে। অশিক্ষা আর কুশিক্ষার কারণে কতো শতো ঘটনা যে গ্রামে ঘটে তা কয়জনের কানেইবা পৌঁছে। এসব খবর কয়জনইবা জানতে চায়।

সেবার তো মেঝো ভাই লণ্ডনে এসে আমার কথাবার্তা শুনে অবাক। বললেন–'তুই

www.pathagar.com

এতো কিছু জানিস কি করে? গাঁয়ের এতো খবর তুই পাস্ কোথায়'? আমি তো চাটগাঁয়ে থেকেও চাঁদপুরের এতো খবর রাখি না–যতটুকু তুই লণ্ডনে বসে রাখিস।'

আসল কারণ হচ্ছে সে যে আমার বেশী কথা বলা, বকবক করার অভ্যাস। যাকে পাই তার সাথেই কথা বলি। হাল পুঁছ করি। একজন থেকে দশজনের খবরা খবর জানতে চেষ্টা করি।

তুই কি জানিস বুবু, জনা ভাই কিভাবে মারা গেলেন? হ্যাঁ, মারা গেছেন! সত্যিই খুব অল্প বয়েসে মারা গেছেন। তোর কি মনে পড়ে, জনা ভাইয়ের সাথে যার বিয়ে হয়েছিল সেই মেয়েটি আমাদের ক্লাসমেট ছিল। ফর্সা, সুন্দর, মেয়েটি। কি যেন ওর নাম ছিল! ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল বেশ ধূমধামের সাথে। সারারাত পাড়া জাগিয়ে কলের গান (গ্রামোফোন রেকর্ড) বাজিয়েছে—

'না মাঙ্গে এ সোনা-চান্দি, মাঙ্গে দর্শন দেবী.
তেরী দুয়ারে খাঁড়া এক যোগী।'

বাজিয়েছে —

'লেকে পহেলা পহেলা পেয়ার.
ভরকে আঁখোমে খোমার
যাদু নগরী ছে আয়া হ্যায় কোয়ী যাদুগর।'

বাজিয়েছে আরো—

'হায় আপনা দিল তু আওয়ারা
না জানি কিসপে আয়েগা-- ।'

হিন্দি গান কিছুই বুঝতাম না। তবু রাত জেগে চুপি চুপি পেছনের বারান্দায় বসে আমরা দু'বোন কান পেতে গান শুনেছি। পরদিন আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে গেছে চারবেহারার পালকী। পেছনে বরযাত্রী। পালকীর আগে আগে একটা লোক সঙ-এর মতো সেজে হাতের লাঠি নাচিয়ে নেচে নেচে গেয়েছে—

'মাহাইয়ার মাহারে কাহান্দাহাইলাম
পোহেলার মাহারে আহাসাহাইলাম
আহাল্লাহা বোল, আহাল্লাহা বোল
বোল, বোল, বোল, বোলোরে,
আল্লাহ- রাসূল বোলোরে
আহাল্লাহা --- বোল--'

অর্থাৎ —

'মেয়ের মাকে কাঁদালাম,
ছেলের মাকে হাঁসালাম
আল্লাহ বোল–আল্লাহ বোল।'

www.pathagar.com

বিয়ের পর জনাভাই খুবই সুখী ছিলেন। দু'টো বাচ্চাও তার হয়েছিল।

একদিন রোজার মাস। সারাদিন রোজা রেখে সন্ধ্যেয় ইফতার করবেন। খুব মাথাধরা ছিল সারাদিন। ঘরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ছিল। ভাবলেন, রোজা ভেঙ্গে শুধু মাত্র পানিটুক গিলেই ঔষধটা আগে খেয়ে নেবেন। কারণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খালি পেটে নাকি খেতে হয়।

দাওয়ায় বসে মাকে বললেন, ঔষধটা দিতে। মা একই কৌটায় রাখা দু'রকম পুরিয়া থেকে একটা পুরিয়া তুলে ছেলেকে দিলেন। পুরিয়া খুলে গুঁড়োগুলো গেলার সাথে সাথেই জনা ভাই পাগলের মতো লাফাতে শুরু করলেন। তার বিকট চিৎকারে আশে পাশের বাড়ীর লোকজন একত্রিত হয়ে গেলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার নাক-মুখ দিয়ে বড় বড় কৃমি বেরুতে লাগলো কেঁচোর মতো। জনা ভাই বেহুশ হয়ে গেলেন।

গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার বললো—'এর চিকিৎসা আমি জানি না।'

মতলবের বড় বড় ডাক্তারের কাছেও নিরাশ হলেন সবাই। ডাক্তাররা বললেন–'মাথা ধরার ঔষধের পরিবর্তে সে পিপঁড়ে মারার ঔষধ খেয়েছে। খালী পেটে খেয়েছিল বলে পেটের ক্ষুধার্ত কৃমিগুলো তাতে পাগল হয়ে যে দিকে ফুটো পেয়েছে সেদিকেই বেরুতে চেষ্টা করেছে। কিছু বেরিয়েছে, কিছু বেরুবার পথে পথে আটকে মরে রয়েছে। এখন ঢাকায় না নিলে আর কিছুই করা যাবে না। মতলবের এই ছোট বাজারে সেসব যন্ত্রপাতি নেই।'

হাসপাতালে ভর্তির যাবতীয় ফর্মালিটি সারতে সারতে বেশ অপেক্ষা করতে হলো। জনা ভাই এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেননি।

পরদিন দুপুরের লঞ্চে জনা ভাইয়ের লাশ ফিরে আসে স্ত্রী ও কন্যার দুর্ভাগ্যের প্রতীক হয়ে।

মিনুর বরের মৃত্যুও অনেকটা এ ধরনেরই।

ঔষধ সে ঠিকমতোই পেয়েছিল। শহরের ডাক্তার শহর থেকে ঔষধ দিয়েছিল। আর বাড়ীর লোকেরা সেই ক্যাপসুলগুলো ভেঙ্গে চামচে করে গুলিয়ে তাকে খাইয়েছে। এভাবে তার গলায় ঘা হয়ে যায়।

সে অন্যান্য খাবার তো দূরের কথা, একটু পানিও গিলতে পারতো না। তারপর আর কি! যিনি পাঠিয়েছিলেন তিনিই তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

বুবু, তুই কি বোর হয়ে গেছিস? বিরক্ত হয়ে গেছিস আমার কথা শুনতে শুনতে!

রাগ করিসনে বুবু। আমার তো এটা অভ্যাস। তোর তো তা জানাই আছে যে, কোনো কথা আমি চট করে বলতে পারি না। তুই নিজেই তো কতো রাগ করেছিস, আমি কোনো কথা শর্ট করে বলতে পারি না বলে। কতো সময় বলেছিস–'অতো শানে নযুল বাদ দিয়ে মূল ঘটনাটা বলতো।'

আমার কতো ঘটনাই তো তুই জানিস না।

www.pathagar.com

তুই কি জানিস পহেলীকে কিভাবে আমি বড় করেছি?

এ সময়টা তুইও খুব সুখে ছিলি না। তোর আকাশেও তখন বড় বড় মেঘের ঝড় শুরু হয়ে গেছে। কখনো কখনো তা প্রবল আকারে আসতো সারা পৃথিবী অন্ধকার করে। তুই অনেক ঝাপটা সয়ে, অনেক আঘাত সয়ে চেষ্টা করেছিস তোর উড়ু উড়ু চালাটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে। বিদ্যুতের চমক আর কানফাটা আওয়াজে যখন বজ্রপাত হতো-তুই তখন ভয়ে চুপসে যেতি, কিন্তু তবু হাল ছাড়িসনি।

আব্বার অনেক দুঃখ ছিল, অনেক আফসোস ছিল। বড় বড় দীর্ঘশ্বাসে ঘরের গুমোট বাতাস যেন আরো গুমোট হয়ে উঠতো। আমি আব্বার মনের কষ্ট সইতে পারতাম না। যে বাবা নিজের সব আরাম হারাম করে আমাদের মানুষ করেছেন-হৃদয় উজার করে আমাদের ভালোবেসেছেন, তিনি তো ইচ্ছে করে আমাদেরকে অপাত্রে ফেলে দেন্ নি।

আব্বাকে আমি কোনোদিন দোষারোপ করিনি। যা হচ্ছে আমি মনে করতাম, সবই আমার ভাগ্য! আমার নসীব! আমার মালিক আমার জন্য যে কাহিনী তৈরী করে রেখেছেন, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আমাকে সে ভূমিকা পালন করে যেতে হবেই। কারণ এ তো আর সেই ইউসুফ ভাইয়ের নাটকের 'কালির মা'-এর ভূমিকা নয় যে, ভালো না লাগলে বদলে দেয়ার জন্য কারো কাছে আবদার করা যাবে।

তবে একটা জিনিস খোদা আমাকে দান করেছিলেন। আমি আজো খোদার কাছে সে জন্য শোকর আদায় করি। শত হতাশার মাঝেও আমি নিরাশ হইনি। আবার অন্ধকারকে আমি অবজ্ঞাও করিনি। আঁধারে নিজের পথ চিনে নিতে আমি ভুল করিনি। আমার চার পাশে যখন অমানিষার অন্ধকার দৈত্যের মত দাঁত মেলে আমাকে ঘিরে ফেলেছিল, কখনো নিশাচর বাদুড়ের ডানা ঝাপটা, হুতুমের ভয়ংকর চোখ আর শেয়ালের চিৎকারে আমি ধৈর্য হারাইনি। আমি জানতাম, প্রতিটি পূর্ণিমার পর যেমন অমাবশ্যার অন্ধকার অবধারিত হয়ে থাকে, তেমনি প্রতিটি অমাবশ্যার পর পূর্ণিমার চাঁদ তার 'ঢলঢল তনু নিয়ে আনন্দে বিভোর' করে দেয় পৃথিবীকে।

তুই পূর্ণিমার পর অমাবশ্যা দেখেছিস বুবু? আমি জানতাম না অমাবশ্যার পর পূর্ণিমার চাঁদ সত্যি সত্যি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আসলে আল্লাহর কাছে কি নেই! শুধু একাগ্রতার সাথে, গভীর বিশ্বাসের সাথে চাইতে হয়, চেয়ে নিতে হয়। তাঁকে যদি 'খালেক' হিসেবে মানি তাহলে তাঁকে 'মালিক' হিসেবেও মানতে হবে। আর কারো মালিক যদি খুব শক্তিশালী ও খুব দয়ালু হয় তাহলে তাঁর আদেশমতো কাজ করে তাকে সন্তুষ্ট রেখে অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকা যায় এবং তাঁর ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নির্ভরশীল হওয়া যায়। আল্লাহর দান এবং দয়া–ক্ষমতা ও দক্ষতার ওপর আমার গভীর আস্থা ছিল। আমি হয়তো আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছি, আমার সমস্যার কোনো সমাধান দেখছি না- কিন্তশ্চ আমি এটা জানতাম যে, আমার সকল সমাম্যার সমাধান তাঁর কাছে আছে। তিনি এসবের একটা সুব্যবস্থা করে দেবেন। আমার জন্য একটা পথ এবং ভালো পথই তিনি খুলে দেবেন।

www.pathagar.com

নিশুতি রাতের নিশ্ছিদ্র আঁধারে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তাম। আমার মালিকের দিকে দু'টিহাত পেতে বলতাম -'আমি শুধুমাত্র তোমারই এবাদত করি, আমি শুধুমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই। তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও! আমরা সবাই তোমার মুখাপেক্ষী , তুমি তো কারো মুখাপেক্ষী নও মালিক।'

অবশেষে দয়াময় আল্লাহ আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলেন। আমার মনে সাহস ও শক্তির সঞ্চার করলেন।

বাবার ঘাড়ে পড়ে পড়ে খেয়ে আমি তো কোনোমতে দিন কাটাচ্ছিলাম, কিন্তশ্চ পহেলীর জন্য তা মোটেই শোভনীয় ছিল না। আব্বা যখন হঠাৎ করেই জান্নাতবাসী হলেন তখন আমাকে দু'চারটি কথা বলে যাবার সময় বা সুযোগও তিনি পাননি।

আব্বার মৃত্যুর পর আমার মনে হলো, আমি সত্য সত্যই বে-ঘর হয়ে গেছি।

পৃথিবী আমার জন্য ক্রমশঃই ছোট হয়ে আসছিল। আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্যোগপুর্ণ, সবচেয়ে অসহনীয় ও সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সময় ছিল সেটা। আব্বার তিরোধানের পর সংসারে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেলো যা আমাকে সত্যিই অতিষ্ট করে তুললো।

আব্বা ছিলেন আমার জন্য তরবারীর সামনে ঢালের মতো। আমাকে নিয়ে কিছু ভাবতে হলে আব্বার ছবি সবার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। আমার কোনো অনিষ্ট করার চিন্তা কারো মাথায় এলে আব্বাকে ডিঙ্গিয়ে তা করতে হবে ভেবে তারা পিছিয়ে যেতো। কিন্তশ্চ যেদিন আব্বা হঠাৎ করে আমাদের কাউকে কিছু না বলে হার্টএটাকের শিকার হয়ে নিজেকে সপে দিলেন বিধাতার সিদ্ধান্তে–মালাকুল মওতের হাতে সেদিন আমার চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকা শেয়ালগুলো যেন লেজ নেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

পহেলীর বাবার সাথে আমার বনিবনা নেই, তাকে আমি পছন্দ করি না, তার কাছে যাই না–একথা গাঁয়ের কারোই অজানা ছিল না। অনেকেই এ সুযোগটা কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যাদের ঘরে বউ আছে, বাচ্ছা-কাচ্ছা আছে তারাও নতুন নতুন পোশাক পরে নতুন নতুন ভঙ্গি নিয়ে ছুঁতানাতা ধরে আমাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে শুরু করলো। তখন আমি আমার আজীবনের 'আমার-আমার' করা জায়গায় আমার অবস্থানকে আর 'বাঞ্ছিত' হিসেবে পেলাম না। আমার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় আমি যেন নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত হিসেবে আবিস্কার করলাম। জীবনে এই প্রথম আমার মনে হলো–'আমাদের ঘরে,' 'আমাদের বাগানে', 'আমাদের ঘাটলায়', 'আমাদের আঙ্গিনায়' আমি বড় অসহায়! আমি একজন 'অবাঞ্ছিত' বাইরের মানুষ। আমাদের বাড়ীতে এখন 'আমাদের' শব্দটি যেন আমার জন্য বড় বেমানান। এ শব্দটি যেন আমাকে নিয়ে বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলছে-'সারা জীবন যদিও তুমি তোমার এই পিত্রালয়ের প্রতিটি জিনিসের সাথে জড়িত ছিলে, কিন্তশ্চ তুমি এখন

www.pathagar.com

অন্য একটি বাড়ীর সাথে, অন্য বাড়ীর লোকজন বা জিনিসপত্রের সাথে জড়িত হয়ে গেছো। এই 'আমাদের বাড়ী', 'আমাদের কাচারী', 'আমাদের গরু', 'আমাদের ক্ষেত', 'আমাদের ঘর', 'আমাদের পুকুর'–এসব শব্দ এখন থেকে ভুলে যাও। বলছিল যেন–'ইউ বিলং টু দি আদার হাউস, আদার পিপল নাউ।'

আমি আমার কলম বন্ধুদের যখনই চিঠি লিখতাম, কখনো নিজের জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস লিখতাম না। তবে মাঝে মাঝে ফাঁক-ফোকড়ে যে দু'একটা কথা এসে যেতো না-তা নয়। ঢাকায় অনুকেই লিখতাম শুধু খোলাখুলিভাবে। অনুও লিখেছে, লিখে গেছে সে বার বার। অনুর প্রায় চিঠিই আমি আব্বাকে দেখাতাম। তার চিঠি আমার মনোবল বাড়াতো।

আব্বার মৃত্যুর পর অনেকেই চিঠি লিখেছে শোক জানিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে।

অনু আমার অনেক উপকারে এসেছে। আমি গ্রামে থেকে যেসব কবিতা লিখে পাঠাতাম তা সে বিভিন্ন পত্রিকার মহিলা বিভাগে পৌঁছে দিতো । সেগুলো যখন ছাপা হতো তার কপি আমাকে পাঠাতো । তাই হঠাৎ করে কখনো ইত্তেফাক, কখনো আজাদ বা দৈনিক পাকিস্তান ইত্যাদি পত্রিকাও ডাক পিওনের মাধ্যমে স্বশরীরে হাজির হতো। আসতো সাপ্তাহিক বেগম, সাপ্তাহিক জাহানে নও। পড়ে কি যে খুশী হতাম!

এ সময় খবরের কাগজ খুলে চাকরীর বিজ্ঞাপনগুলো খুব মনোযোগের সাথে পড়তাম। কিন্তু, আমি যে কোন্ চাকরীর যোগ্য তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারতাম না।

আমার চাকরীর প্রয়োজন ও আকাংখা দু'টোই অনুকে লিখেছিলাম। অনু খোঁজ-খবর রাখতে লাগলো। একদিন চিঠি পেলাম। অনু লিখেছে-'ঢাকায় একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা বেরুচ্ছে। তারা মহিলা বিভাগের পরিচালিকার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তোর যেহেতু চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বহু লোকের সাথে জানাশুনা আছে, তাই বিষয়টা খোঁজ নিয়ে দেখতে দোষ নেই।'

আমি লিখলাম কয়েকজনকে। পত্রিকাটি যারা বের করছেন তাদের মধ্যেও দু'এক-জনকে লিখলাম। তারা আমাকে দরখাস্ত করতে উৎসাহ দিলেন। উৎসাহিত করলেন আরো দু'তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতার উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আমি দরখাস্ত করতেই 'ইন্টারভিউ'-এর জন্য ডাকা হলো আমাকে। আমার তো 'পালপিটেশন' শুরু হয়ে গেলো। পত্রিকায় কোনো বিভাগে লেখা আর পত্রিকার সে বিভাগ পরিচালনা করা এক জিনিস নয়। আমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। টিকে গেলে কিভাবে আমি কাজ চালাবো! আমার তো গেটআপ, মেকআপ, ড্যামী করা কিছুই জানা নেই!

কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, চারকীটা আমার খুব প্রয়োজন কারণ, পহেলীকে মানুষ করতে হলে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন দেখা দিলো ইন্টারভিউর জন্য শহরে গেলে আমি থাকবো কোথায়-কার কাছে? সবাই বললো তোর বাসায় থাকার জন্য। কিন্তু এটা খুব একটা সহজ ছিল না আমার মতো একটা সদ্য শহরে আসা গ্রামের মেয়ের জন্য। তোর বাসা ছিল তেজগাঁয় আর আমার অফিস উয়ারীতে। প্রতিদিন এতোটা পথ একাকী সফর করা আমার পক্ষে কতোটুকু সম্ভব হবে। এনিয়ে নিজেই সন্দিহান হয়ে পহেলীর বাবাকেই খবর পাঠালাম। খবর পাঠালাম এ বলে যে-'আমি পহেলীকে ও আম্মাকে নিয়ে ঢাকার আসছি। এখন থেকে সব কিছু ভুলে গিয়ে একত্রে থাকবো।'

আমার এ সিদ্ধান্ত ছিল যেন ইচ্ছে করে কুইনিন চিবিয়ে খাওয়ার মতো। ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে হারিয়ে যাবার মতো, মৌচাকে নাড়া দিয়ে গাছের সাথে নিজেকে বেধেঁ রাখার মতো। আমি জানতাম এ সিদ্ধান্ত আমার জন্য অসহনীয় যন্ত্রণার, তবু পহেলীর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে হলেও আমি পহেলীকে নিজের পায়ে দাড়ঁ করাতে চেষ্টা করবো। পহেলীকে আমি লেখাপড়া শেখাবো। অনেক বড় হবে পহেলী। কোনোদিন মানুষের কাছে তাকে যেন ছোট হতে না হয়, হাত পাততে না হয়। বরং মানুষের জন্য সে যেন কিছু করার সামর্থ রাখতে পারে।

ঢাকায় যাওয়া আম্মার জন্যও কিছুটা জরুরী হয়ে পড়েছিল। আম্মার শরীরে রক্ত ছিল না, শ্বাস-কাঁশিতে ভূগতে ভূগতে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিলেন আম্মা। পহেলী নাদুস নুদুস বাচ্চা, বয়স যা তার চেয়ে ওকে বড় দেখাতো। আম্মা তাকে কোলে তুলতে পারতেন না, তবু সারাক্ষণ আগলে রাখতেন। আমার মনে হতো আম্মা যেন পহেলীকে আমার চেয়েও বেশী ভালোবাসেন। আমি কখনো পহেলীকে একটা চড় মারলে আমাকে আম্মার দু'টো চড়ের আঘাত সহ্য করতে হতো, আমি পহেলীকে একটা কিল মারলে আমাকে আম্মার তিনটে কিল খেতে হতো।

ছোট ভাইয়া এ নিয়ে খুব মজা করতো। বলতো-'আহা, আজ আর তোমাকে ভাত খেতে হবে না, তুমি ছোট মার তিনটে কিল খেয়েছো। ছোট মার এক একটা কিল ঠিক ভাদ্র মাসের তালের মতো তোমার পিঠে কি 'দুরুম' করেই না পড়েছিল! আর মারবে কখনো পহেলীকে?'

আসলে পহেলীকে বাড়ীতে সবাই ভালোবাসতো।

পহেলীকে নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছি শুনে সবারই মন খারাপ। একে তো বাড়ী থেকে পহেলী 'পহেলি দফা' বেরুচ্ছে তার ওপর আবার আম্মাকেও নিয়ে যাচ্ছি। আম্মার চিকিৎসা না করিয়ে উপায় ছিল না। যতই ঔষধপত্র খাচ্ছিল কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, বরং দিনদিনই শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম-কাজ যখন পাবো তখন এই সুযোগে আম্মার চিকিৎসাটাও করা যাবে।

কিন্তু বড় আম্মা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি বাঁধ সাধলেন। আপত্তি জানালেন-'সোজা কথা, শহরে যাবার কোনো দরকার নেই। শহরের চিকিৎসা হচ্ছে কাটা-ছিঁড়া করা।'

www.pathagar.com

আমি অনেক বোঝালাম বড় আম্মাকে। বুঝিয়ে-শুজিয়ে রাজি করালাম। কিন্তু সারারাত ঘুমুলেনা না বড় আম্মা। গুনগুন আওয়াজ করে কাঁদতে থাকলেন। আমার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলেন–'জোড়ের পাখী বেজোড় করে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? আমি কার সাথে আর আমার সুখ দুঃখের কথা বলবো?'

ঢাকায় এসে যথাযথ 'ইন্টারভিউ'-এ এটেণ্ড করলাম। আল্লাহর শোকর! আমার চাকরীও হয়ে গেলো।

কিন্তু কাজ করা যত সহজ ভেবেছিলাম, কাজ করতে এসে কাজকে ততো সহজভাবে পেলাম না। আসলে যে পোস্টে আমাকে নেয়া হয়েছে সে দায়িত্ব পালন করার মতো তেমন কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। অফিসে কাউকে জিজ্ঞেস করবো বা কারো কাছে শিখে নেবো-এমন কেউ ছিল না। আমি যে সেকশনের ইনচার্জ ছিলাম সে সেকশনে আমিই ছিলাম একমাত্র মহিলা। শেষ পর্যন্ত বড় সাহেব মানে সম্পাদক সাহেবকে বলতেই হলো আমার দুর্বলতার কথা।

বড় সাহেব আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অফিসের প্রতিটি লোকও আমাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। বড় সাহেব অভয় দিয়ে বললেন–'কাজ যা জানো তাতে কোনো অসুবিধে নেই, আস্তে আস্তে শিখে যাবে। দেখি আমি, মাসুমকে বলবো তোমাকে মাঝে মাঝে একটু বুঝিয়ে দিতে। মাসুম অত্যন্ত ভালো ও বিশ্বস্ত ছেলে।'

বুবু, তুই কি মাসুমকে দেখেছিস্? না তুই দেখিসনি। তুই তার ছবি দেখেছিলি। মাসুম সোজা সিথি কাটতো। মাথা ভর্তি ঝাকড়া চুল ছিল তার, বড় বড় চোখ। তুই তার নাম দিয়েছিলি কবি নজরুল। তোর কি মনে পড়ে এসব বুবু?

এর পরের ঘটনা আর তোকে কি বলবো? সবই তো একে একে ঘটে গেলো গল্পের মতো। এটা তো জানিস যে, সন্দেহ, অবিশ্বাস, উদ্ভট আর বিকৃত চিন্তা, কুৎসিত মনোভাব দিয়ে পৃথিবীতে কেউ কাউকে জয় করতে পারে না, বরং দূরেই ঠেলে দেয়।

যা আমি ভাবতে চাইনি, আমার আগেই সে সন্দেহের আবর্তে হাবুডুবু খেয়ে তা ভেবে রেখেছিল সে। যা আমি করতে চাইনি, অবিশ্বাসের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে আমাকে তাই করতে বাধ্য করেছিল সে।

দু'চোখ লাল করে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেছিল পহেলীর বাবা–'মাসুম নামের ছেলেটার সাথে তোমার কি সম্পর্ক, আমার কি তা জানার অধিকার আছে?'

'তা তো আছে।' স্বাভাবিক কণ্ঠ আমার।

'তোমার রুমে সে যায় কেন?'

'আমার রুমে?' অবাক হয়ে আমি পাল্টা প্রশ্ন করি।

'হ্যাঁ, সেদিন আমি নিজের চোখে দেখেছি, অফিসে তোমার রুম থেকে মাসুম বেরুচ্ছে।'

'অফিস আমার বাবার ঘর নয়।'

'তর্ক করো না। আমি জানি, ওটা তোমার বাবার ঘর নয়। কিন্তু অফিসে যেটা

www.pathagar.com

তোমার নিজস্ব রুম সেখানে অন্য পুরুষ ঢুকবে কেন?'

'বিনা দরকারে কেউ ঢুকবে না, কাজ থাকলেই ঢুকবে।'

'কি এমন কাজ তোমার রুমে জমে থাকে সেই জোয়ান মরদের জন্য?'

পহেলীর বাবার কথার মধ্যে একটা নোংরা ইংগিত ছিল। আমি তার কটাক্ষ সহজে মেনে নিতে পারলাম না। বললাম-'জোয়ান মরদের কাজটা যদি আপনাকে দিয়ে হয় তাহলে কালই চলুন, আপনি করে দেবেন সে কাজগুলো।' বলেই তাকালাম তার দিকে।

তাকে আপনি করেই আমি সম্বোধন করতাম। এটা সে-ই বলে দিয়েছিল-'স্বামীকে তুমি করে ডাকলে তাকে অসম্মান করা হয়। আমাকে আপনি করে বললেই আমি খুশী হবো।'

কোনো বিষয়ে তর্ক তুললে পহেলীর বাবা সহজে থামতো না। প্রথমে দেখা যেতো হালকা বাতাস। ক্রমশঃ ওই বাতাসে ধূলি উড়িয়ে তুফান নামিয়ে দিতো।

আমার জবাব পহেলীর বাবার মরমে আঘাত করেছিল। বাঘের মতো হুংকার তুলে বললো-'তুমি তো মনে হয় অন্ধকে হাইকোর্ট দেখাতে চাচ্ছো। আমি জানি না একটা সুন্দরী মেয়ের রুমে একটা জোয়ান ছেলে কি জন্য যায়! কি তার কাজ, আমি কি তা বুঝি না!'

'না, আপনি কিছুই জানেন না। জানতে চাইলে অফিসে গিয়ে বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেই জবাব পাবেন।'

'তাকে জিজ্ঞেস করে কি হবে? সে-ও তো তোমার আরেকজন...।'

'থামলেন কেন? বলে যান, বলে দিন যা মুখে আসে।'

'আমি দেখি না সে যখন কথা বলে কিভাবে তোমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে।'

'ছিঃ! ছিঃ! এতো নোংরা কথা আপনি বলতে পারলেন?'

'তুমি করতে পারো, আমি বলতে পারবো না?'

'ঠিক আছে, বলে যান। দেখি বলতে বলতে কতোদূর চলতে পারেন।'

ঝগড়া ওখানেই থেমে যায়নি। অনেকক্ষণ ধরে চলেছে এর জের।

অফিসের সময় হলে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

মন আমার ভীষণ খারাপ ছিল। অফিসে ঢুকে দু'চারটে কাজ যা ছিল তা সেরে ফেললাম। ভাবলাম, আজ আর সরাসরি ঘরে ফিরবো না। খালাতো ভাই জাহের থাকে ফার্মগেটে। ওর বাসায় গিয়ে কিচ্ছু সময় ওর বৌ'র সাথে কাটিয়ে আসবো। কলিং বেল টিপতেই পিয়ন এলো। বললাম-'আমার সাথে চলো, একটা ট্যাক্সী ডেকে দেবে।'

www.pathagar.com

অফিসের গেটেই জাহেদ সাহেবের সাথে দেখা। এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। আমাকে অত্যন্ত ভালো জানেন। বললেন–'আজ খুব তাড়াতাড়ি ঘরে যাচ্ছেন? আপনার আম্মার শরীর ভালো তো?'

'জ্বী, আম্মা এখন একটু ভালো। আমি একটু ফার্মগেটে যাবো।'

'অ, ফার্মগেটে! ঠিক আছে আপনাকে একটা ট্যাক্সী ডেকে দিচ্ছি।'

'এ সময়ে ট্যাক্সী পাওয়া মুশকিল, আমি সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

তাকিয়ে দেখলাম মাসুম সাহেব, কথাগুলো বলছেন কেরামত সাহেবকে উদ্দেশ্য করে।

জাহেদ সাহেব এতোক্ষণ খেয়াল করেননি, মাসুম সাহেব এখানে দাঁড়িয়ে। বললেন–'আরে, তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

জাহেদ সাহেব আর মাসুম সাহেব উভয়ই আমাদের পত্রিকার এসিষ্টেন্ট এডিটর।

'আমি একটু মগবাজার যাবো, মিটিং আছে। আপনি যাবেন না?'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জাহেদ সাহেব বললেন–'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাকেও তো যেতে হবে। অফিসে সামান্য কিছু কাজ আছে, সেরে নিই।'

এ সময়ে ঘটঘট আওয়াজ করে একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো। মাসুম সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–'আপনি উঠে পড়ুন।'

আমি বললাম–'আসলে এটা ঠিক সুবিচার হচ্ছে না। আপনি আমার অনেক আগে থেকে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'তাতে কিছু হবে না। আমি শীগগীরই আরেকটা পেয়ে যাবো।'

'দেখুন, আপনার সময়মত মিটিংয়ে পৌঁছা দরকার। আমি তো মিটিংয়ে যাচ্ছি না। আমার একটু দেরী হলে কিছু আসে যায় না।'

জাহেদ সাহেব হেসে বললেন–'কিছু আসে যায় না এটা ঠিক, তবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুব ভালো দেখায় না।'

ট্যাক্সীওয়ালা বিরক্ত হয়ে পড়েছিলে বোধ হয়। সে মাথার গামছা খুলে তার পাশের সিটটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো–'ওডেন ছার ওডেন, একজন সামনে বহেন, একজন পিছে বহেন না।'

জাহেদ সাহেব ফিরে যাচ্ছিলেন। ঘুরে এসে বললেন–'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করো না! তুমি ড্রাইভারে পাশে বসে যাও। পথে মগবাজারে নেমে পড়বে। ড্রাইভার তাকে ফার্মগেটে নামিয়ে দেবে।'

আমি ভীষণ ইতস্ততঃ করছিলাম। আমার ঘরের অবস্থা, আমার মনের অবস্থা তো মাসুম সাহেব জানেন না। তিনি আমাকে ট্যাক্সীতে উঠতে বলে ড্রাইভারের পাশে বসে হাতল ধরে ঝুলে রইলেন।

মগবাজারের মোড়ে এসে মাসুম সাহেব নেমে গেলেন। ট্যাক্সীওয়ালার হাতে টাকা

www.pathagar.com

দিয়ে যাবার সময় নীচের দিকে তাকিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'আপনাকে ফার্মগেটে পৌঁছে দেবে। ভাড়া আমি চুকিয়ে দিয়েছি।'

আমি কিছু বলবার আগেই ট্যাক্সী ছেড়ে দিলো।

তুই জানিস বুবু, এ ছোট ঘটনাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল!

সে সব সময় আমাকে পাহারা দেয়, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নিতে থাকে, এতোটা আমি জানতাম না । আমি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই সে অফিসে গিয়েছিল। দৈনিক পত্রিকার অফিস সারাক্ষণই জমজমাট থাকে। সে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ে। আমার রুমে কাউকে না পেয়ে রেগে-তেতে সন্দিহানভাবে একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করে আমার কথা। তিনি জানান যে, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। গেটে নেমে এসে গেট কীপারকে জিজ্ঞেস করে–সে দেখেছে কিনা মহিলা সম্পাদিকাকে ভেতরে ঢুকতে।

গেট কীপার জানায়—'জ্বী আমি ঢুকতেও দেখেছি, বেরিয়ে যেতেও দেখেছি।'

'সংগে কেউ ছিল?'

'না, কেউ ছিল না। মাসুম সাহেব যে ট্যাক্সীতে গেলেন, উনিও সে ট্যাক্সীতেই উঠলেন দেখলাম।'

'কোথায় গেলো জানো?'

'তা তো বলতে পারবো না।'

পহেলীর বাবাকে আর পায় কে! যা সে ভেবেছিল তাই! শুধু অফিস নয়, লোকটার সাথে এখন বাইরেও ঘোরাফেরা শুরু হয়েছে।

এ যেন সেই নজরুলের কবিতার পংতি–'পড়বি তো পড় মালীর ঘাড়েই।'

জাহের ভাই'র বাসায় আমি বেশীক্ষণ ছিলাম না। জাহের ভাইয়ের স্ত্রীকে তোর মনে পড়ে? আমাদেরই সমবয়সী ছিল। আমরা তাকে কোনোদিন 'ভাবী' বলে ডাকিনি, 'শেলী' বলে ডাকতাম। শেলী ছিল আমার সার্থক বন্ধু ।

ফেরার পথে শেলীকে নিয়েই ফিরলাম। আম্মা বেশ গম্ভীর, রাগ রাগ ভাব নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। আমাকে বা শেলীকে দেখে কিছু বললেন না। শেলী আম্মাকে সালাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কেমন আছেন খালা?'

'বেঁচে আছি।' আম্মা অন্যদিকে তাকিয়ে রাগতঃস্বরে বললেন।

আমি বুঝতে পারছিলাম না, আম্মা কেন রাগ করেছেন। হয়তোবা শরীর বেশী অসুস্থ। হাসপাতালে এখনো ভর্তি করানো হয়নি তার জন্যও মন খারাপ হতে পারে। শেলীর দিকে তাকিয়ে বললাম—'আম্মাকে দু'একদিনের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করবো।'

রাগে ফেটে যাচ্ছিলেন আম্মা-'আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করাবার কোনো দরকার

www.pathagar.com

নেই। কালই আমি জাহেরকে বলবো আমাকে বাড়ীতে রেখে আসতে। অন্ততঃ মান-ইজ্জত নিয়ে শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিতে পারবো।'

'কি ব্যাপার আম্মা? কি হয়েছে?'

'কি আর হবে? তুমি যত পারো বাইরে ঘোরো। কোথায় গিয়েছিলে আজ অফিসের নাম করে?'

'অফিসের নাম করে? কেন অফিসেই তো গিয়েছি।'

'হ্যাঁ! গিয়েছো, গিয়েছো লোক দেখানোর জন্য। তারপরই বেরিয়ে গেছো কোনো একটা ছেলের সাথে।'

আম্মার কথার জবাব দেবার মতো মানসিকতা এতোক্ষণে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। বুঝতেই পারছিলাম, পহেলীর বাবা বিরাট কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছে, যার ঝাপটার আঘাত আম্মার গায়েও লেগেছে।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে আম্মা বললেন—'চুপ করে আছো কেন? আমি যা বলেছি তাতে অসত্য কিছু আছে?'

এবার শেলী উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। পিঠে হাত রেখে বললেন–'কিরে, কোথায় গিয়েছিলি?'

'ফার্ম গেটে, তোমার বাসায়।'

'খালা যা বলছেন'...বলতে বলতে থেমে গেলো শেলী।

'আম্মা যা বলছেন তা একটাও আম্মার কথা নয়, পহেলীর বাবার কথাগুলোই আম্মার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।'

আম্মা থমকে ওঠলেন। শেলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন–'তাহলে জিজ্ঞেস করো তাকে সত্যি কোন্‌টা।'

আমি শেলীকে বললাম—'শেলী, মানুষকে ফাঁসীর হুকুম যখন দেয়া হয় তখন তাকে এটা বলে দেয়া হয় যে, কি কারণে তাকে ফাঁসী দেয়া হবে, তার দোষ কি। কিন্তু আমার সাথে আম্মা যেভাবে রাগ করছেন, আমি এখনো বুঝতে পারিনি যে, আমার অপরাধটা কি।'

আমি রুম থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসে রইলাম।

বিকেলে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো পহেলীর বাবা। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

'আহ্! শেষতক ফিরেছ তাহলে!'

আমি নীরব।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে ব্যাঙের হাসি হাসলো। বললো—''তা ফিরবেই তো। কতোক্ষণ আর থাকা যায়?'

আমি তবু নীরব।

থামলো না সে। আবার বলে উঠলো—''মাসুম সাহেবের সাথে কোথায় গিয়েছিলে?'

www.pathagar.com

আমি অবাক হয়ে বললাম—'আপনি কি বলছেন এসব? আমি কোথায় যাবো তার সাথে?'

'যাওনি তুমি মাসুম সাহেবের সাথে?'

'না' দৃঢ় কণ্ঠ আমার।

'মিথ্যে কথা বলো না। জিহবা খসে পড়বে তোমার। আজ তুমি অফিসে ছিলে না। সারাদিন তার সাথে বাইরে বাইরে ঘুরেছো। অনেক লোক তোমাদের একত্রে দেখেছে।'

'কে দেখেছে?' আমি প্রশ্ন করি।

'আমি দেখেছি, আরো দশজনে দেখেছে।'

'দশজনে দেখেছে আর আপনিও দেখেছেন? এই মিলে যদি এগারো হয় তাহলে আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি ঠিকই জানি যে, ওই এগারোর পাশাপাশি প্রথম একও আপনি- দ্বিতীয় একও আপনি।'

'ঠিক আছে, আমি একাই দেখেছি, কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে চাও যে, মাসুম সাহেবের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই? সে তোমাকে ভালোবাসে না?'

'মাসুম সাহেবকে আপনার এতো হিংসা কেন? সে কেন আমার মতো একটা মেয়েকে ভালোবাসতে যাবে–যে কারো স্ত্রী, কারো মা! আপনি তার উপর মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন।'

'অপবাদ দিচ্ছি? ঠিক আছে, যদি আমার কথা মিথ্যে হয় তাহলে বলো যে, সে তোমার বাপ!'

আমি ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম-'আপনি যাকে ইচ্ছে বাপ ডাকতে পারেন, আমি পারবো না। আমি যা তা লোকের মেয়ে নই।'

সে সবেগে উঠে এসে আমার চুল টেনে ধরে সজোরে মারতে থাকলো। আমি দুঃখে-ব্যথায়-লজ্জায় মাথা নীচু করে কাঁদতে থাকলাম।

বুবু, তোকে এসব কিছু কিছু যে বলিনি তা নয়, কিন্তু তুই নিজেই তখন নিজের বরের ব্যবহারে অতিষ্ট ছিলি, যার কারণে তোকে সব কথা বলিনি বুবু।

কথায় বলে–'সত্যের জয়-একদিন হয়।' আম্মাকে আমি দিনের পর দিন বলেও যা বোঝাতে পারিনি-ঢাকায় ক'দিন আমার কাছে থেকে আম্মা আস্তে আস্তে নিজে নিজেই অনুভব করলেন যে, পহেলীর বাবার সাথে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেদিন ভেজা চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা দেখছিলাম। হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে পেছন ফিরে দেখি পহেলীর বাবা।

প্রথমেই বলে উঠলো-'একটা কেচি দাও তো! অনেক দিন থেকে ভাবছি, কিন্তু করতে মনে থাকে না। আজ যখন মনে পড়লো-তখন কাজটা করেই ফেলি।'

www.pathagar.com

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে তেমন কোনো কাজের প্রয়োজন দেখতে পেলাম না। বললাম-'কি কাজ? কেচি দিয়ে কি হবে?'

'তোমার চুলগুলো কেটে খাটো করে দেবো। এতো লম্বা চুল, মাথায় আঁচল তুলে দিলেও তার নীচে আধা হাত বেরিয়ে থাকে। কেটে অর্ধেক করে দেবো।'

'মাথা খারাপ নাকি! আমি চুল কাটবো না।'

'কাটবে না কেন? চুল দেখিয়ে মানুষ পাগল করতে চাও নাকি?'

'কে পাগল হবে আমার চুল দেখে?'

'তোমার অফিসের লোকেরা তো পাগল হয়েই আছে।'

'আমার অফিসের লোকেরা কি আমার চুল কোনোদিন দেখেছে? আমি কি কোনোদিন খোলা চুলে অফিসে গিয়েছি?'

'ছোট লোকের মতো স্বামীর মুখে মুখে জবাব দিও না। আমি বোকা নই, কানা নই। সব বুঝি, সবকিছু দেখি। ঘরে আমার ভাগিনা-ভাতিজারাও আসে।

'আপনার ভাগ্নে, ভাস্তেরা আসে, তাদের যত্নআত্তি করি, রেঁধে খাওয়াই, এটাও কি আমার দোষ?'

'দোষের হতে কতক্ষণ?

'সে আপনি ভালো জানেন। কিন্তু আমি তাদের চাচী, মামী, আমি তাদের মায়ের মতো। তাদের সামনে না গেলেও সেটা আমারই দোষ হবে।'

পহেলীর বাবা রেগে গিয়ে আরো কি যেন আজে বাঝে কথা বললো।

ঘেন্নায় আমার গা রিরি করতে লাগলো। মনে হলো আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি তার সাথে কমপ্রোমাইজ করার চেষ্টা করে।

তার সাথে যখনই ঝগড়ায় পারতাম না, তখনই আমি বসে ফুঁফিয়ে কাঁদতাম। আসলে আমিও কম ঝগড়াটে মেয়ে নই। ঝগড়া যে পারি না তাও নয়, কিন্তু যখন অত্যাধিক অপমানজক কিছু সে আমাকে বলে ফেলে. তখন দুঃখে-কান্নায় আমার গলা বন্ধ হয়ে যায়। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ঠোঁট আর থুতনী বিকৃত হয়ে শুধু কাঁপতে থাকে। আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি।

এরপর থেকে আমি সাদা শাড়ী পরে অফিসে যাওয়া শুরু করি। যাকে বলে ধুতি। পাড়হীন সাদা ধবধবে সুতী শাড়ী পরে আমি অফিসে গেলে বিষয়টা যারাই দেখলো, তাদের চোখে কেমন ঠেকলো, কিন্তু কেউ কিছু বললো না।

কিন্তু বললো পহেলীর বাবা।

'এ সবের অর্থ আমি বুঝি।'

'কোন্ সবের?'

'এই যে সাদা শাড়ীর ঢং।'

www.pathagar.com

'ঢং কিসের? আপনিই তো বলেন—অফিসের পিয়ন থেকে বড় সাহেব সবাই নাকি আমার রূপে মুগ্ধ। সবাই নাকি আমাকে হা করে দেখে। তাই তো মুর্দার মতো পোশাক পরে অফিসে যাই।'

'মুর্দার মতো নয় বিধবার মতো।'

'আমি তা মনে করি না।'

'মনে করো না, বিশ্বাস করো।'

'বিশ্বাসও করি না। আমি বিধবা হতে যাবো কেন?'

'বিধবা হবে না? পোশাক দেখে লোকেরা তোমাকে ঠিক বিধবাই ভাববে।'

'তাতে আমার লাভ?'

'লাভ এই যে, লোকেরা তোমাকে ফ্রি ভাববে। ভাববে ভ্যাকান্সি আছে, সুতরাং দলে দলে দরখাস্ত আসবে।'

আমাকে চুপ দেখে একটু থেমে আবার বললেন—'সাদা শাড়ী ছেড়ে দাও। বিধবা সেজে লাভ নেই। আমি তোমাকে কারো হতে দেবো না। দরকার হলে হাত-পা ভেঙ্গে ঘরে বসিয়ে রাখবো, তোমাকে পঙ্গু বানিয়ে দেবো।'

আমি নীরব। দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নেমেছে আমার। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন–'এসব রং-ঢং ছেড়ে সোজা পথে আসো। স্ত্রী'র মতো সেবাদাসী হয়ে থাকো। আমি আমার জীবন থাকতে আমার নাকে 'দম' থাকতে তোমাকে ছাড়বো না। হাজার মাসুম তোমাকে ভালোবাসলেও পাবে না।'

প্রতিদিন তার এ ধরনের ব্যাঙ্গ,এ ধরনের কটুক্তি শুনে শুনে আমার মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল।

এরপর একদিন সম্পাদক সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম–'স্যার, দেখুন আমি ড্যামী তৈরী করেছি। এখন আর দরকার হবে না কারো সাহায্যের।'

স্যার বললেন–'আমি তো এখুনি চলে যাবো। আজ হয়তো মাসুম তোমাকে কাজ বোঝাতে যাবে। তখন তাকে এ ড্যামী দেখিয়ে বলে দিও যে, তাকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

আমি আমার রুমে বসে চিঠি পত্রের জবাব লিখছিলাম। পিয়ন এসে বললেন—'আপা, মাসুম সাহেব আসতে চান।'

'আসতে বলো।'

আজ কেন যেন মাসুম সাহেবকে আমার বেশ লজ্জা করতে লাগলো। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আমি অন্যান্য সময়ের মতো সহজভাবে কাজ করতে পারছিলাম না। আঁকতে গিয়ে চট করে আমার হাত থেকে পেন্সিলটা ছিঁটকে পড়লো।

মাসুম সাহেব ফ্লোরে খুঁজতে লাগলেন। আসলে পেন্সিলটি পড়েছিল আমার পাশেই। মাসুম সাহেব খুঁজতেই থাকলেন।

www.pathagar.com

বললাম—'আমি পেয়েছি।' এরপরও তিনি আমার দিকে তাকালেন না। ফ্লোরের দিকে যে দু'টি চোখ ব্যস্ত ছিল সে দৃষ্টি গিয়ে টেবিলের ওপর নিবিষ্ট হলো। আমি অবাক হলাম। আমার দুঃখ হলো। এই লোকটা সম্পর্কে কি যা তা-ই না বলছে সে।

একটু কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'আপনি এখনো পড়াশুনা করছেন?'

মাসুম সাহেব পেপারে দাগ কাটতে কাটতে বললেন–'জ্বী।'

'কোথয় আছেন?'

'ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। প্রথম বর্ষ।'

'কোন্ সাবজেক্ট?'

'বাংলায় অনার্স।'

'কোথায় থাকেন?'

মাসুম সাহেবের সাথে কোনোদিন কোনো পার্সোনাল কথা বলিনি। আজ এতোগুলো কথার জন্য তিনি মনে হয় মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। হয়তোবা কিছুটা অবাকও হলেন। একটু বিরতি নিয়েই তিনি আমার শেষ প্রশ্নের জবাব দিলেন। শুনে আমি উৎসাহের সাথে বললাম—'আরে ওখানে তো আমাদের এক ভাই'র ছেলে থাকে। হাবীব ওর নাম। চেনেন নাকি?'

একটু দম নিয়ে মাসুম সাহেব বললেন—'হাবীব, তাই না!'

'জ্বী!'

'হাবীব তো আমার রুমমেট। আপনার এক ভাই'র ছেলে সে?'

'আমার মানে আমার নয়, পহেলীর বাবার।'

'পহেলী কে?'

'জ্বী, আমার একমাত্র মেয়ের দ্বিতীয় নাম। ওর একটা ভালো নামও আছে।'

মাসুম সাহেব হাসলেন আমার কথা শুনে। ততক্ষণে হাতের কাজ সব শেষ করে ফেলেছিলাম আমি। তিনি নেড়েচেড়ে ভালো করে দেখছেন, দু'তিন জায়গায় একটু দাগ দিলেন। বললেন—'চমৎকার মেকআপ হয়েছে। এরপর আমাকে আর আপনার দরকার হবে না।'

সম্পাদক সাহেব অত্যন্ত খুশী হলেন শুনে যে, আমি আমার কাজে পারদর্শী হয়ে গেছি। এটাই শুধু দরকার ছিল। এছাড়া গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ তো আমি অনায়াসে লিখতে পারি। একটা পত্রিকার মহিলা বিভাগ চালাবার জন্য যা যা দরকার সব যোগ্যতাই আমার আছে। যা ছিল না তা-ও অর্জন করে নিলাম তাঁদের সহায়তায়। সুতরাং সম্পাদক সাহেবের চেয়ে আর কে বেশী খুশী হবেন!

এরই মধ্যে 'স্বাধীনতা সংখ্যা' বের করার প্রশ্ন আসলো। আমি নিজস্ব বিভাগের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ করে সাহিত্য পাতার জন্য একটা কবিতা লিখলাম। লিখতে লিখতে কবিতাটা একটু বড়ই হয়ে গেলো। নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য দিয়েও দিলাম।

www.pathagar.com

অফিসে আমার রুমে ঢুকতে হতো সম্পাদক সাহেবের টেবিল ক্রশ করে। সেদিন অফিসে ঢুকে রুমে যাবার পথেই স্যারের টেবিলের ওপর স্বাধীনতা সংখ্যার প্রিন্ট অর্ডার দেয়া কপিটা দেখে তুলে নিলাম। স্যার তখনো আসেননি।

রুমে নিয়ে কপিটা দেখতে থাকলাম। দেখলাম আমার কবিতাটাও ছাপা হয়েছে, তবে প্রথম দিকের চার লাইন ও শেষের চার লাইন বাদ দিয়ে। একি! আমি অবাক হয়ে গেলাম।

স্যার আসতেই তার কাছে কপিটা মেলে ধরলাম। আমার কবিতার এ নাজেহাল অবস্থা কি করে হলো জানতে চাইলাম। স্যার ঝুঁকে পড়ে দেখলেন কবিতাটা। বললেন—'কই, ঠিকই তো আছে।'

আমি কবিতাটা আবার দেখলাম। বললাম—'না স্যার, মোটেই ঠিক নেই। আমার কবিতাটাকে সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ করে এখানে ছাপা হয়েছে।'

'পড়ে তো মনে হচ্ছে না। কোনো খুঁত তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ন্যা স্যার, এ কবিতাটা আমি ষোলো লাইন লিখেছি। প্রথম ও শেষের চার করে আট লাইন বাদ দিয়ে মাঝখানের আট লাইন শুধু এখানে ছাপা হয়েছে।'

'হ্যাঁ তাই তো!' স্যার সংগে সংগে কলিং বেল চাপলেন।

শাহেদ নামের ছেলেটি ছুটে এসে দাঁড়ালো নম্রভাবে। স্যার তাকে বললেন—'মাসুমকে ডাকো?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসুম সাহেব এসে দাঁড়ালেন স্যারের পাশে। স্যার অত্যন্ত স্নেহময় কণ্ঠে বললেন—'এটা দেখো তো মাসুম। কবিতাটার এ অবস্থা হলো কি করে?'

'কি হয়েছে স্যার! ঠিকই তো আছে।'

'ঠিক হয়নি। তোমার হাতে পড়ে একজনের ষোলো লাইন কবিতা আট লাইনের পঙ্গু শরীর নিয়ে কোনো রকমে স্বাধীনতা সংখ্যার জন্য বেঁচে রয়েছে।' কথাটা বলে স্যার শব্দ করে হেসে উঠলেন।

মাসুম সাহেব হাসলেন না। চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে স্যারকে পৃষ্ঠার প্রতিটি কবিতা, প্রতিটি কলাম দেখিয়ে বললেন—'অমিত্রাক্ষর সনেটে কেউ যদি ষোলো লাইন কবিতা লিখে মনে করে একটা বিশেষ সখ্যায় পুরো কবিতাটা ছাপা হবে তা ভুল। বিশেষ সংখ্যার জন্য আরো অনেক লোকই লেখেন। তারাও চান যে, তাদের লেখা ছাপা হোক।'

'হ্যাঁ, তাই তো!' স্যার সহজভাবে বললেন।

মাসুম সাহেব কলামের হিসেব দেখিয়ে সম্পাদক সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন—'এই ষোলো লাইন কবিতা পুরো ছাপলে এখান পর্যন্ত আসে। সে ক্ষেত্রে আরো দু'টো লেখা আমাকে বাদ দিতে হয়। তাই এটা যখন আমি পড়ে দেখলাম যে, মাঝখানের আট লাইন ছেপে দিলেই চলে, অর্থের বা ভাবের কোনো পার্থক্য হয় না তখন তাই করলাম।'

'হ্যা তাই তো।'

এবার মাসুম সাহেব একটু রুক্ষভাবেই বললেন—'আমি এতোটা গোঁয়ার গোবিন্দ

www.pathagar.com

নই, যা করি ভেবে—চিন্তেই করি। অন্য কারো পছন্দ হবে না বলে আমি কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ করতে পারি না।'

কাগজটি হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন মাসুম সাহেব। সম্পাদক সাহেব হেসে বললেন—'চটে গেছে। আসলে সে অত্যন্ত ভালো ছেলে—জিনিয়াস!'

আমি বুঝতে পারলাম, মাসুম সাহেবের শেষের কথাগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করেই। কবিতাটা আমার লেখা, ওখানে আমিই বসে আছি। অভিযোগটা যে আমার তরফ থেকেই এসেছিল এ ব্যাপারে মাসুম সাহেব নিশ্চিন্ত ছিলেন।

রুমে ফিরে এসে আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো। যে লোকটা এতোদিন ধরে নিজের সময় নষ্ট করে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ শিখিয়েছে, আজ আমি তারই নামে নালিশ দিলাম!

মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। কাজটা যে ঠিক গাদ্দারের মতো হয়ে গেলো। তিনি আমাকে কী ভাববেন! ভাববেন—'ছোটলোক, গেঁয়ো, অশিক্ষিত ব্যবহার জানে না। উপকারীর উপকার স্বীকার করতে জানে না, অকৃতজ্ঞ লোক!'

অফিস থেকে বেরুবার মিনিট পাঁচেক আগে কি মনে করে বেল টিপলাম। শাহেদ এলো। কিছুই না বলে সে দাঁড়িয়ে থাকলো। বললাম—'মাসুম সাহেব আছেন?'

'জ্বী, মনে হয় চলে গেছেন। টেবিল তো খালি।'

'দেখো তো উনি আছেন কিনা? থাকলে একটু ডেকে দাও না। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাবো।'

কিছুক্ষণ পর শাহেদ এসে বললো—'মাসুম সাহেব এইমাত্র ফিরেছেন। আপনার কথা বলেছি। এক্ষুনি আসছেন।'

শাহেদ চলে গেলে আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। মাসুম সাহেব এলেন না। বেরুবার জন্য তৈরী হলাম। ঠিক বেরুচ্ছি এ সময়ে শাহেদ এলো। বললো—'মাসুম সাহেব এসেছেন।'

'আসতে বলো।'

শাহেদ চলে গেলো। মাসুম সাহেব ভেতরে আসতেই কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললাম-'আমি আসলে জানতাম না এই বিশেষ সংখ্যা আপনার দায়িত্বে বেরুচ্ছে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিনি।'

'পুরো কবিতাটা ছাপবার কোনো উপায় ছিল না। পারলে ছেপে দিতাম। আপনার সাথে তো আমার কোনো শত্রুতা নেই।'

'মাফ করবেন। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি।' বলতে বলতে আমার চোখ ছলছল করে উঠলো।

মাসুম সাহেব একবারও চোখ তুলে তাকিয়ে তা দেখেলেন না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন একথা বলে—'ওসব ভুলে যান, আমি কিছু মনে করিনি।'

www.pathagar.com

মাসুম সাহেব বেরিয়ে যাবার সংগে সংগে রুমে ঢুকলো পহেলীর বাবা, তুফানের বেগে। দু'চোখ তার লাল, যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

'অল্পের জন্য বেঁচে গেলো। শালাকে ধরতে পালাম না। আজ তো হাতেনাতে প্রায় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'কার কথা বলছেন?'

'তোমার প্রিয়তম—ভালোবাসার ধন, এইমাত্র যে আমার ভয়ে বেরিয়ে গেলো।'

'আপনার ভয়ে মানে?'

'ভয়ে নয় তো কি! নিশ্চয়ই দরজা দিয়ে আমাকে ঢুকতে দেখেছিল, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়েছে।'

'পালায়নি। কথা শেষ হয়ে গেছে তাই চলে গিয়েছে।'

'কথা! কিসের কথা তোমার তার সাথে? কি দরকার?'

'দরকার ছিল বলেই এসেছেন। আমিই ডেকে এনেছিলাম।'

'কেন ডেকেছো? এখন তো নাকি আর কাজ শেখাতে হয় না।'

'কাজ ছিল বলেই ডেকেছিলাম। এসব তর্ক ঘরে গিয়েও করা যাবে। অফিসে ঝগড়াঝাটি করে লোক হাসাবার দরকার নেই।'

'একটা লোক বিনা দরকারে তোমার রুমে ঢুকবে আর আমি কিছু বললেই তা অন্যায় হয়ে যাবে?'

আমি চুপ করে রইলাম। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ব্যাপারটা এখানে থেমে গেলে ঘটনা আর বাড়তো না। কিন্তু সে থামলো না। সারাপথ ধরে বললো, তবু শান্ত হলো না। ঘরে পা রেখেই আম্মার সামনে সেই একই কথা নিয়ে তোলপাড় করতে থাকলো।

আমি যতোই ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে চাইলাম, সে আমার কথা বিশ্বাস করলো না। আমাকে গালাগাল তেমন করলো না বোধহয় আম্মা ঘরে ছিলেন বলেই, তবে মাসুম সাহেবের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলো।

বেচারা মাসুম! আসলে তার কি দোষ? বিনা কারণে তাকে এতো অপবাদ দিচ্ছে, এতো গালাগাল করছে। এই সব কিছুর জন্য আমার মনে হলো, আমিই যেন দায়ী। তার সামনে এসব কথা বললে, এতো গালাগাল করলে তিনি অবশ্যই তার পক্ষের কথাগুলো বলে বিষয়টা পরিষ্কার করে দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এসবই তো হচ্ছে তার পেছনে পেছনে। মাসুম সাহেবের সামনে এর অর্ধেক কথা বলার সাহসও যে পহেলীর বাবার নেই তা আমি জানি।

রাতে খেতে বসে আবার নতুন রূপ ধরলো পহেলীর বাবা। মাছের তরকারী দিয়ে ভাত খেলো। ডাল পাতে নিয়েই প্লেট ঠেলে দিয়ে বললো—'ওয়াক থু! এসব মানুষে কি খেতে পারে?'

আমার গলা শুকিয়ে গেলো ভয়ে। আবার না জানি কি ভুল হয়ে গেছে। শংকিতভাবে বললাম—'কি হয়েছে?'

'কে রান্না করেছে ডাল?'

'আমি।'

www.pathagar.com

'তা আমি ডাল নিয়েই বুঝতে পেরেছি। রান্নার সময় মন তো আর রান্নায় থাকে না।'

আমি একটু ডাল চামচে করে তুলে মুখে দিয়ে দেখলাম, ডালে লবণ দেয়া হয়নি। বুঝতে পারলাম, সে বিনা কারণে রাগেনি। অপরাধীর সুরে বললাম—'আহ্ হা! ডালে নুন দিতেই ভুলে গেছি।'

'যেখানে দুনিয়া ভুলে গেছে সেখানে নুন তো কিছুই না।'

আমি বিরক্তির সাথে বললাম—'সারাদিন একই কথা শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি।'

'তা তো হবেই। যেমন গরম ভাতে বিলাই বেজার হয়। তবে মনে করো না যে, তাকে আমি এমনি ছেড়ে দেবো!'

আমি চুপ করে থাকলাম। এই তিক্ত প্রসঙ্গটি আমার জীবনকে আরো অতিষ্ট করে তুলেছে।

এক গ্লাস পানি এক টানে খেয়ে আওয়াজ করে গ্লাসটা রাখলো সে। বললো—'তাকে আমি গুন্ডা দিয়ে পিটিয়ে লাল করে দেবো, তাকে আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো, তাকে মেরে হাড্ডি গুঁড়ো করে তার হাতে তুলে দেবো।'

আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। বললাম—'কেন, আপনার কি ক্ষতি করেছে সে?'

'তুমি জানো না কি ক্ষতি করেছে?'

'না, আমি জানি না।'

'যেদিন রাস্তায় মাস্তান লাগিয়ে তাকে ধোলাই করবো সেদিন সবই জানবে।'

'আপনি মিছেমিছি একটা লোককে সন্দেহ করছেন।'

'একটা লোককে নয়, অনেককে। তোমার অফিসের অনেকেই তোমার জন্য পাগল হয়ে আছে। আমি আছি বলেই কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'অফিসের কেউ আমাকে বোনের মতো মনে করে, কেউ নিজের মেয়ের মতো। তারা কেউ আমাকে বাজে দৃষ্টিতে দেখে না। অফিসে আমার একটা সম্মান আছে।'

'আমি জানি তার কারণ। রূপের গরিমায় মাটিতে আর পা পড়ে না। আমি তোমার এমন দশা করবো যে, মানুষ তো দূরে থাক, কুকুরও তোমার চেহারা পছন্দ করবে না।'

আমি ধৈর্যের সীমা হারিয়ে ফেললাম। রাগে-দুঃখে আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করলো। দাঁতে দাঁত কামড়ে হাতের চামচটা দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মেরে দাঁড়ালাম। চামচটা জোরে দেয়ালে ঘা খেয়েই ফিরে এসে তার পিঠে লাগলো। তড়াক করে লাফিয়ে চুলের মুঠি ধরলো সে। খোঁপা খুলে সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়লো চুল। এরপর তার মতো লোকেরা সাধারণতঃ যা করে তাই সে শুরু করলো। পহেলী ছুটে এসে তার পা চেপে ধরলো—'আমার আম্মুকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!'

হঠাৎ আম্মা উঠে এসে সামনে দাঁড়ালেন। বহুদিন পর আবার আম্মার সেই রণমূর্তি দেখলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভারী আওয়াজে বললেন—'সাবধান! আমার মেয়ের গায়ে আর একটি বার হাত তুলেছ তো তোমার দফারফা করে ছাড়বো। ওর মা এখনো মরে যায়নি। তুমি কি ভেবেছ, ওর বাবা মরে গেছে বলে ওর আর কেউ নেই? তোমার সম্পর্কে আমার অনেক উঁচু ধারণা ছিল। ঢাকায় না এলে আমি তোমাকে সত্যিকারভাবে চিনতে পারতাম না। আমি কালই আমার ছেলেদের খবর দিচ্ছি...' বলতে বলতে আম্মা হাঁপিয়ে উঠলেন। আর সংগে সংগে ঢলে পড়লেন বেহুশ হয়ে।

আম্মার হুশ হারাবার আগেই আম্মার কথার মাঝখানেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। আমি

www.pathagar.com

কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। কাজের মেয়েটাকে বললাম—'তুমি কি হাবীব যেখানে থাকে সে জায়গাটা চিনো?'

মেয়েটি বললো—'হ্যাঁ চিনি, আমার মা ওখানেই কাজ করে।'

'এক্ষুনি গিয়ে তাকে ডেকে আনো। আর শোন, যাবার পথে বাড়িওয়ালী বানুর আম্মাকে একটু এক্ষুনি আসতে বলো।'

বানুর আম্মা অল্প-বিস্তর আমার ব্যাপারে জানতো। আমার সমবয়সী। আমাদের মধ্যে খুবই ভাব ছিল। ছুটির দিন এলেই বানুর আম্মার সাথে আমি এখানে সেখানে বেড়াতে যেতাম।

খবর পেয়েই বানুর আম্মা ছুটে এলো। আমি আমার বাঁ হাতটা ব্যথায় নাড়তে পারছিলাম না। সে মুচড়ে দিয়েছিল। বানুর আম্মা তোয়ালে ভিজিয়ে আম্মার মুখ মুছে দিলো। সরষের তেল পানিতে গুলিয়ে আম্মার মাথার তালুতে ঘষতে লাগলো।

ততক্ষণে হাবীব এসে পড়েছে।

হাবীবকে দেখে আমি যেন নিজের কোনো আপন মানুষকে পেয়ে গেলাম। আমার নীরব কান্না হাবীবের চোখের পাতাও শুকনো রাখলো না। হাবীব পাশের গলি থেকে তার একজন পরিচিত ডাক্তার নিয়ে এলো। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আম্মাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিলেন। হাবীবই সব ব্যবস্থা করলো। আম্মাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলাম—হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে।

এরপরের কথা তুইও জানিস বুবু। তুই শুনেই আম্মাকে দেখতে হাসপাতালে এসেছিস। আম্মা তখন তোকে অনেক কথা বলেছিলেন। পরে তোর কাছে আমি তা সবই শুনেছি।

ঢাকায় ক'দিন একত্রে থেকে আম্মা বুঝতে পেরেছিলেন, সে কি ধরনের মানুষ। দেখতে পেয়েছিলেন তার প্রতিটি অভদ্রজনোচিত অমানুষিক আচরণ, স্ত্রী নামক ক্ষুদ্র জীবটির প্রতি তার ক্ষমতার অপব্যবহার, তার পাশবিক ও অমানবিক হৃদয়হীনতা।

হাসপাতালে এসে কিছুটা সুস্থ হয়েই আম্মা আমার কাছে খোলাখুলিভাবে অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন। সেদিন আম্মাকে সব কথা খুলে বলতে আমি যদিও কিছুটা লজ্জা পেয়েছিলাম, কিন্তু কেন জানি না একটুও ভয় পাইনি। আম্মাকে বলতে পেরেছিলাম, আমি এর সাথে আমার শেষ চেষ্টা করেছি আম্মা, কিন্তু আর পারছিনে। আম্মা, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কেন আল্লাহ তায়ালা আত্মহত্যাকে হারাম করলেন? আমার যে সেটার অনেক প্রয়োজন।'

আম্মা আমাকে প্রশ্ন করেছেন—'যে ছেলেটিকে নিয়ে এতো যুদ্ধ চলছে সে কি জানে এসব কথা?'

আমি বলেছি—'আমি জানি না। আমি তো বলিনি। হাবীব বলতে পারে। সে হাবীবের রুমমেট।'

আম্মার সাথে হাবীবের অনেক কথা হলো।

হাবীব আসলে খুবই ভালো ছেলে। নিজের ক্ষতি করে পরের উপকার করতো। তার মন ছিল খুব নরম। কারো দুঃখ, কারো কান্না সে সহ্য করতে পারতো না। কথায়

www.pathagar.com

কথায় মেয়েদের মতো হেসে গড়াগড়ি খেতো। আমি তাকে ভালো জানতাম, তাকে ছেলের মতো ভাবতাম এবং নিজের মনের কথা বলতাম।

পহেলীকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়েছিলাম একদিন বানুর আম্মার সাথে পহেলীর ছবি তোলার জন্য।

বানুর আম্মা বললো—'চলুন আমরাও ছবি তুলে নিই, দু'জনের একটা-গ্রুপ ফটো আজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

'ঠিক আছে। মন্দ কি!'

পহেলীর একা একটা, পহেলীর সাথে আমার গ্রুপ একটা ও বানুর আম্মার সাথে আমার একটা ছবি তুললাম।

আজ/কাল করে করে আর ছবিগুলো আনা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে আম্মা হাসপাতালে গেলে অফিস-বাসা-হাসপাতাল করে করে আমি আর সময়ই করতে পারছিলাম না।

হাবীবকে কাগজটা দিয়ে অনুরোধ করলাম ছবিগুলো স্টুডিও থেকে নিয়ে আসার জন্য।

আমার কোনো আদেশ বা অনুরোধ হাবীবের কাছে কখনো অবহেলিত হয় না। তোর তো মনে আছে বুবু, তুই সব সময় বলেছিস—'ওখানে তুই আর কিছু না পেলেও একটা একান্ত অনুগত, একান্ত বাধ্যগত সুবোধ ছেলে পেয়েছিস। যার কাছে তোর কথা হচ্ছে সারিবাদী সালসার মতো।'

হাবীব আমাদের ছবিগুলো এনে রুমে বসে দেখছিল। এ সময়ে নাকি মাসুম পেছন থেকে হাসতে হাসতে বলেছিল—'অত মনোযোগের সাথে কার ছবি দেখ্‌ছিস? কোন্ মেয়ের না জানি কি সর্বনাশ করিস আবার!'

ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেই হাবীব বলেছিল—'সর্বনাশ অলরেডী হয়েই গেছে।'

'মানে?'

'মানে রাবণের খপ্পরে পড়েছে।'

ঠোঁট উল্টিয়ে মাসুম বলেছিল—'আরে রাবণের লংকা উড়িয়ে দিয়ে হলেও তোর নায়িকাকে উদ্ধার করে আনবো আমরা। শুধু বল, তুই যেমন তাকে ভালোবাসিস, সে তোকে তেমনি ভালোবাসে কিনা?'

'এখানে ভালোবাসা শব্দটি নেই।' হাবীবের উত্তর।

মাসুম নাকি ব্যাঙ্গ হেসে বলেছে—'তা আমি জানি জাঁহাপনা।'

'না, তুই কিছুই জানিস না।' হাবীব গম্ভীর।

হাবীবের গাম্ভীর্যে মাসুমও সিরিয়াস হয়ে তার পাশে বসে বললো—'আসলে ঘটনাটা কি বল্?'

'শুনে কি করবি? কোনো উপকারে তো আসতে পারবি না।'

'আসতেও পারি। একজন মানুষের জন্য একজন মানুষ জীবন পর্যন্ত দিতে পারে, কবি কি বলেননি—মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তামাম জীবের সেবা।'

'তামাম জীবের লাগবে না। একটা জীবের সেবা যদি করতে পারিস তাহলে এ উসিলায় হয়তো তোর জান্নাত মিলে যাবে।'

'বল, কি করতে হবে?'

'আমার চাচীকে বিয়ে করতে পারবি?'

www.pathagar.com

পায়ের তলায় ভয়ংকর সাপ দেখার মতো আঁতকে উঠলো মাসুম, চমকে উঠে বললো—'তোর চাচীকে! কি বলছিস, তোর মাথা ঠিক আছে?'

হাবীব মাসুমের দু'হাত চেপে ধরে অনুনয়ের স্বরে বলেছিল—'হ্যাঁ, আমার চাচীকে বিয়ে কর না ভাই, আল্লাহর ঘর তৈরী করার সওয়াব মিলবে তোর। বেচারী বড় অসহায়! এক আল্লাহ আর মা ছাড়া দুনিয়াতে তার কেউ নেই। সে বড় মজলুম। বড় অত্যাচারিত!'

হাবীব শুরু থেকে সব ঘটনা খুলে বলেছিল মাসুমকে। সব শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল মাসুম। বিষয়টা তাকে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সত্যি সত্যি ভাবিয়ে তুলেছিল তাকে।

হাবীবকে বলেছিল—'আমার মতো একটা ছেলের জন্য এটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এখানে অনেক **'যদি'** আর **'কিন্তু'** এসে সামনে দাঁড়াবে।'

হাবীব সহজ হেসে বলেছিল—'তা আমি জানতাম। বলার সময় সকলেই বলতে পারে, *"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।"*

কিন্তু বাস্তবে যখন কিছু করার দরকার হয় তখন কেউ পরের কারণে নিজের স্বার্থ বলী দিতে পারে না। জালিমের হাত থেকে মজলুমকে উদ্ধার করার জন্য দরকার হলে জান- মাল কোরবান করে দেবো। মজলুমের জন্য আমার আত্মা, আমার প্রাণ নিবেদিত এসব শুধু মঞ্চের ভাষণ, আর কিছু নয়।'

এরপর মাসুমের সাথে অনেক কথা হয়েছে হাবীবের। মাসুম যে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝেনি তা নয়, তবে তাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকোচ আর আশংকা ছিল অনেক। অনেক প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তাই হাবীবকে বলেছে—'কেউ যদি সাগরের কিনারে থেকে ডুবতে থাকে তাকে সহজেই উদ্ধার করা যায়, কিন্তু যেতে যেতে কেউ যদি সাগরের আধাপথ অতিক্রম করার পর ডুবতে শুরু করে তাকে উদ্ধার করা তো অত সহজ নয় হাবীব।'

'সহজ নয়, তবে তাতে বাহাদুরী আছে।'

'বাহাদুরী যেমন আছে তেমনি উদ্ধারের পরিবর্তে তলিয়ে যাবার আশংকাও আছে।'

'তা আছে। আছে বলেই তো এটা কোনো ভীরু, কাপুরুষের কাজ নয়। এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মন, শক্তি, সাহস থাকতে হবে।'

'সাহসের ব্যাপার নয় হাবীব, এ পথ বড় স্বাপদসংকুল।'

'তাই তো তোকে পা ফেলতে হবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে যাতে তোর নিজের পা কেটে না যায়। তুই এক কাজ কর না। তুই আমার চাচীর সাথে একটু কথা বল।'

মাসুম অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো—'হাবীব, তুই কিছু মনে না করলে তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই!'

'কর।'

'তোর কি তোর চাচার সাথে কোনো শত্রুতা বা মন কষাকষি আছে?'

'না, যদি তেমন থাকতো তাহলে হয়তো এ নিয়ে কিছু ভাবতে পারতাম না।'

'কেন?'

'তোর কি হযরত আলী (রাঃ)-এর একটা ঘটনা মনে আছে? বলছি শোনঃ

"কোনো এক যুদ্ধের ময়দানে একজন কাফেরকে তিনি তরবারীর খুব সামনে পেলেন, দেবেন এক ঘা, তলোয়ার তুললেন। এ সময়ে লোকটি এক দলা থুথু ছুঁড়ে

www.pathagar.com

দিলো হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে। তলোয়ার নামিয়ে ফেললেন হযরত আলী (রাঃ)।

লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন—এ সময়ে আমি এক ঘায়ে তার কল্লা উড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু তা তখন জেহাদের অংশ হতো না, হতো আমাকে থুথু দেবার প্রতিশোধ।"

বুঝেছিস এবার আমার বক্তব্য?'

মাসুম বুঝতে পারলো হাবীবের বক্তব্য।

এরপর আরো অনেক ঘটনা ঘটলো। ক'টা কথা তোকে বলবো বুবু! তুই তো জানিস্, আম্মা হাসপাতালে থাকতে পহেলীর বাবা আমার কথা বলে ক্যাশিয়ারকে ধোঁকা দিয়ে আমার বেতন তুলে নেয় অফিস থেকে। আমাকে নাজেহাল করার জন্য, বিপদে ফেলার জন্য সে কতো চেষ্টাই তো করেছিল, কিন্তু আমার মালিকের সাহায্য ছিল বলে আমি সবটাই সামলে নিতে পেরেছিলাম।

এরই মধ্যে হাবীব একবার হাসপাতালে আম্মার কাছে নিয়ে আসে মাসুমকে। আম্মা অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সরাসরি কোনো কথাই সেদিন তিনি বলেননি। দূর থেকে কিছু ইশারা দিয়েছিল মাত্র। পরে আমি হাবীবের কাছে সবই শুনেছি।

এরই মধ্যে আমার সেই মেয়েলী অসুখকটা আবার দেখা দেয়। পহেলীর জন্মের পর থেকেই আমি এ রোগে ভুগছিলাম। গাঁয়ে এর কোনো চিকিৎসা তেমন ছিল না। রক্ত সুতিকা বলে বলে স্থানীয় ডাক্তাররা যেসব ঔষধ দিয়েছেন সেসবে কোনো কাজ হয়নি। শেষে গাঁয়ের বড় ডাক্তার বলেছিল, শহরে নিয়ে অপারেশন করাতে হবে। একটা মাইনর অপারেশন। কিন্তু তুই তো জানিস, আমার ওসব একান্ত প্রাইভেট কথা শুনবার কেউ ছিল না।

বুবু, তোর তো দাদ হয়েছিল। তোকে চুলকাতে দেখেই তোর বর চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু একই রোগ যদি আমারও হতো, তাহলে আমি কি তোর মত চিকিৎসা পেতাম? বরং এজন্য হয়তো অনেক জঘন্য কথা আমার নামে ছড়াতো সে।

বড় আম্মা তাই বলতেন-'স্বামী হচ্ছে মাথার ছাদ, ইজ্জতের বেড়া।'

আমি সেদিন বুঝেছিলাম-ছাদ ঠিকই, তবে সে ছাদে যদি বড় বড় ফাটল থাকে তাহলে রোদ-বৃষ্টি- ঝড় থেকে তা বাঁচাতে পারে না। বেড়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি সাপ-বিচ্ছু আর বিষাক্ত জন্তু লুকিয়ে থাকে তাহলে প্রতি মুহূর্তেই ছোবল আর মৃত্যুর আশংকা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

আমার ফাটল ধরা ছাদ ছিল আমার জন্য প্রতি মুহূর্তের ভয় আর আশংকার কারণ, ছিল আমার জন্য বিপদসংকুল।

আম্মা সুস্থ হয়ে ঘরে এলেন। আমি বিছানায় পড়লাম। দাঁড়াবার শক্তি আমার ছিল না। বানুর আম্মা ছাড়াও আমার সেই প্রতিবেশী মহিলাটি—যাকে দেখে তুই বলেছিলি 'ফুলের মত সুন্দর' সে-ও সারাদিন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলো। সন্ধ্যের পর আমার প্রচন্ড জ্বর দেখা দিলো। বানুর আম্মা ডেকে পাঠালো পহেলীর বাবাকে। বললো ডাক্তার ডাকবার জন্য। পহেলীর বাবা জানালো, সে এখন ব্যস্ত।

www.pathagar.com

বানুর আম্মা বললো—'আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য সারা জীবন থাকবে, কিন্তু এর যা অবস্থা, এ দুনিয়া থেকে চলে গেলে আর আসবে না।'

পহেলীর বাবা কতোক্ষণ চুপ করে থাকলো। পরে জানালো, তার হাতে এখন টাকা-পয়সা নেই।

জ্বরের ঘোরে আমি আবোল তাবোল বকছিলাম বানুর আম্মা বুদ্ধি করে খবর পাঠালো হাবীবকে। তখন মধ্যরাত। এতো রাতে ঢাকা শহরের ডাক্তাররা ঘুম নষ্ট করে কারো বাসায় রুগী দেখতে যাবে না।

হাবীব উপায় না দেখে মাসুমকে বললো—'কি করা যায়।'

মাসুমের এক খালাতো ভাই ছিলেন বড়ো ডাক্তার। সে শুধু ভাই-ই নয়, বন্ধুও। মাসুম ট্যাক্সী নিয়ে যেতেই তিনি চলে এলেন। হাবীবও এলো তাদের সঙ্গে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে আমি গেলাম হোলী ফ্যামেলি হাসপাতালে রুগী হয়ে। পরদিনই আমার অপারেশন হলো। এ সময়ে তুই ঢাকায় ছিলি না বুবু। শাশুড়ীর অসুখ শুনে তুই চাঁদপুরে গিয়েছিলি। কিন্তু পরে তো সব শুনেছিস বুবু। শুনেছিস পহেলীর বাবার প্রচারণা। কি নোংরা ভাবেই না সে প্রচার করেছিল, মাসুমের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। বিয়ে করার উদ্দেশ্যে মাসুম আমার চিকিৎসা করাচ্ছে। তাই খরচ পাতি সে করেনি, সব খরচ মাসুম বহন করেছে।

বুবু, আমি এতো দুঃখ পেয়েছিলাম, এতো অপমান বোধ করেছিলাম যে, যদি আত্মহত্যা হারাম না করা হতো তাহলে ঐ মুহূর্তে আমি তা-ই করতাম। তবে জীবনেও যা করিনি, সেদিন আমি তা করেছিলাম। তাকে অন্তর থেকে অভিশাপ দিয়েছিলাম এ বলে—

'খোদা তোমার গজব আসুক তার ওপর। তাকে এমনভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী করে দাও-এমনভাবে পঙ্গু করে দাও—যাতে সে সর্বক্ষণ নিজের মৃত্যুই কামনা করতে থাকে, যেমনিভাবে তাঁর অকথ্য অত্যাচারে আজ আমি মৃত্যু কামনা করছি।'

কথাটা সে ফলাও করে প্রচার করলো সর্বত্র, আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার কর্মস্থলে।

অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, চাকুরী আমার ঠিকই থাকলো, হয়তোবা আমি অসহায় বলে, হয়তোবা মেয়ে মানুষ হিসেবে সহানুভূতির কারণে। কিন্তু ঝড়ের সমান আঘাত গিয়ে পড়লো মাসুমের ওপর। ক্ষোভে-অপমানে সে দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগ থেকে চাকরীতে ইস্তফা দিলো।

ব্যাপারটা আম্মার হৃদয়কে আঘাত করেছিল সবচেয়ে বেশী। একটা ছেলে বিনা দোষে-বিনা কারণে তার মেয়ের জন্য শাস্তি ভোগ করবে, এটা আম্মা নীরবে-নিঃশব্দে মেনে নিতে পারেননি।

তিনি হাবীবকে ডাকলেন। বললেন—'মাসুমকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করো। আমি তার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।'

'কোথায় দেখা করবো?'

'আমি জানি না। তুমি জায়গা ঠিক করে আমাকে নিয়ে চলো। মাসুমকেও সেখানে আসতে বলো।'

'রমনা পার্কে কেমন হয়?'

'খোলা মাঠে?'

www.pathagar.com

'তাই তো ভালো। দেয়ালেরও কান থাকে যে।'

'ঠিক আছে।'

যথাসময়ে আম্মা বসলেন তাদের সাথে। আম্মা ছিলেন কথাশিল্পী। কথা বলার আর্ট তিনি জানতেন। কাজেই তিনি আমার হয়ে কোথায়ও কারো সাথে বসলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতাম।

আমি যদিও তখন সামনে ছিলাম না; কিন্তু হাবীবের কাছে পরে সবই জানতে পেরেছিলাম।

মাসুমের বিষণ্ন মুখ আম্মাকে বিচলিত করে তুলেছিল। আহত কণ্ঠ আম্মা বলেছিলেন—'যা ঘটে গেলো, আমি জানি না এ জন্য তোমাকেই অভিযুক্ত করবো, না তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো।'

মাসুম বিনয়ের সাথে বলেছে—'আপনি গুরুজন, আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন কেন? তবে অভিযুক্ত করার মতো কোনো অন্যায় বা গুনাহ যে আমি করিনি তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

'তোমাকে আমি কতোটুকু জানি বাবা, যে তোমাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করবো। তবে যাকে কেন্দ্র করে এ সমস্ত ঘটনা ঘটছে সে তো আমার শরীরের অংশ। তাকে তো আমি জানি—জানি তার দৌড়ের সীমা কতোটুকু।'

মাসুম কিছু না বলে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু চুপ থেকে আম্মা বললেন—'আমি জানি আজ যা কিছু ঘটছে এসব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। আমার মেয়ে তো বিয়ের প্রথম দিন থেকেই অসুখী ছিল। আমি দেখেও তা দেখতে চাইনি—শুনেও শুনতে চাইনি। আজ রাস্তার প্রতিটি মোড় বন্ধ হয়ে যাবার পর আমি মেয়েকে বার করার পথ খুঁজছি।'

মাসুম নীরব দেখে আম্মা দুঃখ করে বললেন—'আল্লাহ তায়ালা আমাকে সব কিছু দিয়েও একটা ছেলের কাঙাল করে রাখলেন। আজ আমার যদি একটা নিজের ছেলে থাকতো, তাহলে আমাকে হয়তো এতো চিন্তা করতে হতো না। বয়সের শেষ প্রান্তে এসে এই জীর্ণ শরীরটাকে টেনে টেনে যেখানে নিজেরই চলা মুশকিল হয়ে পড়েছে'---

আম্মার কান্নাভেজা কণ্ঠের কথাগুলো মাসুমের বুকে শেলের মতো বিঁধলো। আম্মার কথার মাঝখানে বলে উঠলো—'মনে করুন আমি আপনার ছেলে। আমাকে যা বলেন আমি তা-ই করবো।'

চোখের কোণ মুছে নিয়ে আম্মা বললেন—'আমার একটা কথা রাখবে বাবা?'

মাসুম অকপটে বললো—'অবশ্যই রাখবো।'

'না, তুমি রাখতে পারবে না।'

'কেন পারবো না?'

'যারা এরকম অকপটে কথা দেয়, কিছু না ভেবে ওয়াদা করে তারা ওয়াদা রাখতে পারে না। তুমি যে আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবে, কিছুই চিন্তা না করে চট করে বলে ফেললো—অবশ্যই পারবো—তুমি কি করে বুঝলে যে আমি কি বলতে চাইছি। কি করে বুঝলে যে, আমি যা তোমার কাছে চাইবো তা তোমার করার বা দেবার সাধ্য আছে কিনা?'

মাসুম একটু চুপ করে রইলো। এরপর বিষাদের হাসি হেসে বললো—'এই কদিনে আমি আপনাকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে আপনার উপর আমার একটা আস্থা,

www.pathagar.com

একটা ধারণা এসে গেছে। একটা বিশ্বাস এসে গেছে।

'কি বিশ্বাস?' আম্মা প্রশ্ন করেন।

'আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি আমাকে এমন কোনো আদেশ করবেন না-যা মানুষের সাধ্য ও সামর্থের বাইরে। আর কোনো কাজ তা যদি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় তাহলে এটা তো ঠিক যে, আমিও একজন মানুষ।'

আম্মা মাসুমের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরপর বললেন—'মাঝে মাঝে আমি চিন্তা করি, তোমার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তাহলে চুপ করে আছো কেন? কেন প্রতিবাদ করছো না?'

মাসুম বলে—'দুর্গন্ধময় কিছু নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে তাতে দুর্গন্ধ আরো বেশী করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'যে বোবা সে বেঁচে গেছে' এটা আমাদের নবীর কথা।'

'কিন্তু একজন বোবা হলেও সমাজের আর দশজন তো বোবা নয়। আমি মনে করি, তোমার এর প্রতিশোধ নেয়া উচিত।'

'প্রতিশোধ? তা কিভাবে?' মাসুম প্রশ্ন করে।

হাবীব হেসে বলে—'তুই বরং আমার নানীর জামাই হয়ে যা। কি বলেন নানী?

আম্মা চুপ করে রইলেন। মাসুমও কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। এরপর বললো—'আমিও রক্ত-মাংসের মানুষ। আমারও জেদ থাকতে পারে। আমিও মনে মনে তাই ভাবছি, যদি অন্যদিক থেকে আপত্তি না থাকে...।'

আম্মা বললেন—'বাবা, মানুষের জীবন তো আর গরু ছাগলের মতো উদ্দেশ্যবিহীন নয়। মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে না। তুমি সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছো। তোমার মা-বাবা আছেন। তোমাকে নিয়ে তারাও অনেক স্বপ্ন দেখেন। এ সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে অনেক মূল্য দিতে হতে পারে।'

'তা তো শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই—এমনকি যখন এ রকম কিছু আমার চিন্তার আশে পাশেও ছিল না।'

'বাবা, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষকে অনেক ভেবে-চিন্তে এগুতে হয়। পা ফেলবার আগেই দেখে নিতে হয়—'তা নিরাপদ কিনা। পথে কাটা থাকলে তা তোমার পায়ে বিঁধবে আগুন থাকলে তাতে নিজের পা পুড়বে। যদি কোনো জীব বা পোকা-মাকড় থাকে তাতে তোমার হয়তো তেমন কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু তোমার পায়ের তলায় পিষ্ঠ হয়ে তারা জীবন হারাবে নতুবা সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবে।'

'আপনি খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। আমার মা-বাবার আমার ওপর গভীর আস্থা আছে। আপনিও এতোটুকু বিশ্বাস আমার ওপর রাখতে পারেন। আমরা এখানে যে তিনজন আছি, আমাদের অদৃশ্যে আরো এক মহাশক্তিকে সাক্ষী রেখে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার কাছে সে কোনোদিনই অনাদৃত হবে না।'

'বাবা, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে তোমার ওয়াদা পূরণ করার তওফীক দিন। আমি তোমাদের সার্বিক সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করি। দোয়া করি তোমাদের সুখী-সুস্থ, সুষ্ঠু শান্তিময় দীর্ঘায়ুর।'

বিকেলেই আম্মা ডাকলেন জাহের ভাইকে।

জাহের ভাই বললেন—এসব নোংরা কথাবার্তা তিনিও শুনেছেন। তিনিও চান এর একটা ইতি হোক।

www.pathagar.com

আম্মা জানালেন, যে ছেলেটাকে নিয়ে এতো কথা হচ্ছে, তার সাথে আম্মার কথা হয়েছে-দেখাও হয়েছে কয়েকবার। আম্মার ভাষায় ছেলে চাঁদের মতো এবং ভালো বংশের শিক্ষিত ছেলে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মান ইজ্জত বাঁচাতে হলে মুরুব্বীদের সক্রিয় হতে হবে।

তোর মনে পড়ে বুবু, পহেলীর বাবার সাথে যখন ছাড়াছাড়ির প্রস্তাব গেলো তখন সে কি বলেছিল? একটা বিরাট অংকের টাকা দাবী করেছিল সে। ভেবেছিল আমার পক্ষে তা যোগাড় করা সম্ভব হবে না। আমি আমার পরিচিত দু'একজন আত্মীয় ও দু'জন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি যাদের সাথে আমার ছোট বেলা থেকেই যোগাযোগ ছিলো—তাদের কাছে আমার সমস্যার কথা বললাম।

আমার অবস্থা, আমার সার্বিক পরিস্থিতি তাদের কারোই অজানা ছিল না। তারা সবাই আমার সমস্যার সমাধানে সহানুভূতির সাথে সহযোগিতা করলেন।

সিদ্ধান্ত হলো, সে তার কিছু লোকজন নিয়ে এবং আমি আমার কিছু লোকজন নিয়ে মগবাজার কাজী অফিসে গিয়ে একদিকে আমাদের প্রস্তাবমতো কাগজে সই হবে। অন্য দিকে তার প্রস্তাবমতো তাকে তার অংক পরিশোধ করা হবে।

এ প্রস্তাব তার কানে যেতেই সে বললো, সে কোনো রকম কম্প্রোমাইজে আসতে রাজী নয়। আমার সাথে তার কোর্টেই দেখা হবে।

উপায়ান্তর না দেখে আমার মুরুব্বীরা পরামর্শ দিলেন গাঁয়ে চলে যেতে। গাঁয়ের যেখানে যে কাজী অফিসে বিয়েটা রেজিস্ট্রি হয়েছিল, সে কাজী অফিসের মাধ্যমে তাকে চিরতরে বর্জনের কাগজে সই করে সে কাগজ তাকে পাঠিয়ে দিতে।

এরপর আমি শহর ছেড়ে, চাকরী ছেড়ে গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়ে ফিরে আসি। আসার সময় আমাদের লঞ্চে তুলে দিতে হাবীবের সাথে মাসুম এসেছিল। কেন জানি তাকে দেখে সেদিন আমার ভীষণ কান্না পেয়েছিল।

এর পরের ঘটনা তো সব তোরই সামনে। তুইও তখন বাড়ীতে। তার সাথে সম্পর্কের ইতি টানা শেষ কাগজটি সই করে তাকে পাঠালাম। সে আমার নামে কেস করলো। কেসে আসামী হিসেবে রাখলো মাসুম সহ আরো অনেককে।

এরপর দেশের মানচিত্রে পরিবর্তন এলো, আমরা ছিটকে পড়লাম এক একজন এক এক জায়গায়। কোথায় তুই, কোথায় ভাই-বন্ধুরা, কোথায় জাহের ভাই, কোথায় শেলী-আমরা এক একজন তখন ভিন্ন জগতের মানুষ।

পহেলীকে সে চায়নি। অবশ্য পহেলী তো আর ছেলে নয়, কেন সে মেয়ে নামক একটা খরচের বোঝা মাথায় তুলে নেবে? আমার তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। সে চাইলেও পহেলীকে আমি দিতাম না। কারণ পহেলীকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। আর পহেলীকে নিয়ে আমার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মাসুম নিজের শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল।

বুবু, মাসুমকে বিয়ে না করে আমার কি দ্বিতীয় কোনো উপায় ছিল? নিজের জীবনটা না হয় কোনোমতে কেটে যেতো, কিন্তু পহেলীকে কিভাবে আমি মানুষ করতাম, কিভাবে নিজের পায়ে ওকে দাঁড় করাতাম—যদি মাসুম আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে পাশে না দাঁড়াতো?

www.pathagar.com

বুবু, মাসুমকে বিয়ে না করলে আমার কাছে দাম্পত্য জীবনের মূল্য দুর্বোধ্য থেকে যেতো। পুরুষ নামের জীবগুলো যে ভালো মানুষও হতে পারে এ ব্যাপারে আমার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা হতো না। আমার অতীত জীবনে যতটা দুঃখ আমি পেয়েছি তার বহুগুণ বেশী সুখে মাসুম আমাকে রেখেছে। এখন আমার মনে হয় একথাটা আসলেই ঠিক যে—দুঃখের পর সুখ আসে, দুঃসময়ের পর সুসময় আসে। আল্লাহর সাহায্যের চিরঋণী আমি।

বুবু, তুই কি জানিস্ আমি কেমন আছি এখন? তোকে শুধু এটুকু বলতে পারবো- কোনো মেয়ে খুব বেশী ভাগ্যবতী হলে, কোনো মেয়ের ভাগ্য খুব বেশী সুপ্রসন্ন হলেই মাসুমের মতো জীবনসাথী পায়। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবহার মাসুম করেনি, যাতে আমার মনে সামান্যতম দুঃখ বা কষ্ট আসতে পারে। কতো ভালো হতো দুনিয়ার সব পুরুষগুলো যদি মাসুমের মতো 'মাসুম' হতো। তাহলে হয়তো তসলিমার মতো মেয়েদের প্রয়োজন হতো না পুরুষদের বিরুদ্ধে বই লেখার। আবার জবাবের জন্য আমাকেও কলম ধরতে হতো না।

আজ মাসুমেরই কারণেই আমার জীবনে পূর্ণতা এসেছে। পহেলী লন্ডন ইউনিভারর্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েছে। আমার ছেলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সবই মাসুমের কারণে। নতুবা আমার এমন কোনো গুণ, এমন কোনো যোগ্যতা ছিল না—যা দিয়ে আমি এতো সুন্দর একটি বাগান সাজাতে পারি।

ভালো কথা বুবু, যা লেখার জন্য এতো উৎসাহ নিয়ে তোকে লিখতে বসেছি, যে মজার কথাটা তোকে শোনাব বলে শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম, কথা এতো বেড়ে গেলো যে, সেই আসল কথাটাই বলা হয়নি এখনো।

তুই তো নুন থেকে চুন খসলেই রেগে গিয়ে আমাকে সব সময় বলেছিস—'ছিঃ! ছিঃ! তোর কি ঘেন্না-পিত্তা নেই?'

আজ এতো কাল পরে তোর কথাটা সত্যি হয়ে গেলো, হ্যাঁ সত্যি হয়ে গেলো। মজার ঘটনাতো সেটাই, সেটা বলার জন্যই তো এ লেখা শুরু করেছিলাম—এখন সত্যি সত্যি আমার বুকের তলায় পিত্তিটা নেই। আমার পিত্তিটা ওরা 'কী হোল' সার্জারীর মাধ্যমে ফেলে দিয়েছেরে বুবু।

ঘটনাটা খুলেই বলি।

কিছু দিন থেকে আমার বুকে ভীষণ ব্যথা হচ্ছিলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। স্ক্যানিংয়ে ধরা পড়লো আমার গল ব্লাডারে পাথর হয়ে গেছে। ডাক্তার জানালেন—'স্টোন ম্যাচিউরড্ হয়ে গেছে।'

পাথর হয়ে গেছে! ভয়ে আমি চুপসে গেলাম। আমার বুকে পাথর হলো কি করে? আমি তো ফ্যাটি ফুড বেছে খাই, পান-সুপারি খাই না। অবশ্য এটা যদিও ডাক্তারকে বলেছি, সত্যি কথা তো তোকে লুকিয়ে লাভ নেই। তুই তো জানিস, ছোট বেলায় আমাকে প্রতিদিন সকালবেলা কাপে করে এক কাপ 'দুধের সর' খাওয়ানো হতো।

দূর ছাই! সর খেয়েছি ছোট বেলায় আর স্টোন হয়েছে এখন বুড়োকালে—এ কেউ বিশ্বাস করবে নাকি!

www.pathagar.com

তাহলে পাথর কেন হলো বুবু? তুই কি বলতে পারিস, মানুষের পেটে পাথর কেন হয়? আমি সঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা আর বেদনা মুখবুজে সইতে সইতে, হৃদয়ের কোন্দরে চেপে রাখতে রাখতে, অপমান-অবহেলা, অত্যাচার আর নির্যাতনের যন্ত্রণা পাথরের মতো হজম করতে করতেই এক সময় মানুষের বুকে পাথর হয়ে যায়। ঐ পাথর পরে সরাতে হলে পেট কেটে অপারেশন করেই বের করতে হয়। তাতে পাথর তো সরানো যায়, কিন্তু পেট কাটার দাগটা কি আর পেট থেকে কোনোদিন মুছে যায়রে বুবু!

আমার জীবনেও কম কষ্ট আসে নি। আমার কাহিনীও কম বেদনাদায়ক ছিল না! আমাকেও একসময় আমার সব দুঃখ পাথরের মতই হজম করতে হয়েছিল।

অনেক পাথর হজম করতে করতেই কি আমার পেটে পাথর হয়েছিল? কি জানি! আমি তো পাথরের কথা শুনেই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, একবার যখন পাথর হয়েই গেছে তখন আর অপারেশন ছাড়া উপায় নেই। এ জমে থাকা স্টোনগুলো রিমুভ করতে হলে আমাকে অচেতন অবস্থায় অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতেই হবে। তাই নির্দিষ্ট তারিখে অপারেশনের জন্য ভর্তি হয়ে গেলাম।

সন্ধ্যের পর যখন ভিজিটিং টাইম শেষ হয়ে গেলো—মাসুম চলে গেলো, ছেলে-মেয়েরা চলে গেলো। হাসপাতালে আমার কক্ষে শুয়ে আমি খুব শর্টকাটভাবে অতীতে চোখ বুলিয়ে নিলাম । ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণের জন্য তোর সাথে হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। হঠাৎ মনে হলো, এমনও তো হতে পারে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তোর সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে ।

মধ্যরাত । নার্স খুব সন্তর্পণে রুমে ঢুকে শিয়রের ওপর হেডবোর্ড 'নীল বাই মাউথ' কার্ডটি ঝুলিয়ে রেখে টেবিলের ওপর রাখা খাবার পানির জগটাসহ সব তুলে নিয়ে গেলো।

আমি বুঝতে পারলাম, এখন থেকে অপারেশন থিয়েটার পর্যন্ত আমার জন্য কোনো প্রকার খাদ্য বা পানীয় আল্লাহ তায়ালা বরাদ্দ করে রাখেননি। আমার বেডে শুয়ে শুয়ে কাঁচের জানালা ভেদ করে আমি হাউস অব কমন্স ও বিগবেন দেখতে পাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাজনা বেজে উঠল আর ঢং ঢং আওয়াজে রাত দু'টো বাজার সংকেত কানে ভেসে এলো।

আমি উঠে বাথরুমে গেলাম, খুব ভালো করে গোসল করে নিলাম। বিছানার ওপর রাখা পরিষ্কার সাদা চাদরটি ফ্লোরে পেতে তার ওপর হ্যান্ড ব্যাগে রাখা জায়নামাযটি বিছিয়ে 'সালাতুত তসবীহ' পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর তাহাজ্জুদ পড়লাম পুরো বারো রাকাত। তখনো ফজরের সময় হয়নি দেখে বসে বসে দোয়া-দরূদ পড়তে থাকলাম।

ফজরের সময় হতেই ফজর পড়ে মোনাজাত দিলাম—নিজের জীবনের ছোট-বড়, শেরেকী-ফাসেকী, বিদয়াতী, জানা-অজানা, প্রকাশ্য ও অপ্রাকাশ্য সমস্ত গুনাহর জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইলাম। দোয়া করলাম বাবা-মা, ভাই-বোন, নানা-নানী, দাদা-দাদী, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও দুনিয়ার মুসলমান নর-নারী সকলের জন্য।

দোয়ার মাঝে মাসুমের কথা বলতেই অঝোর ধারায় কান্না এলো। বেহেস্তের সুখ-বেহেস্তের রূপ আমার তো জানা নেই বুবু। তাই মালিককে বললাম—'দুনিয়াতে মাসুমকে সর্বদিক দিয়ে তুমি সফলকাম করো, ওর সমস্ত নেক ইচ্ছাগুলো পূরণ করো আর আখেরাতের জন্য আমি নিজে ওর জন্য কিছু চেয়ে ওকে ঠকাতে চাই না। তুমি ওকে তোমার পছন্দমতো পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করো।

www.pathagar.com

ছেলে-মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। ওদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য আমার অনেক কিছু চাওয়ার ছিল। এতো কিছু চাইলাম, চেয়েও বেহায়া বেশরমের মতো হাত পেতেই থাকলাম। বলতে থাকলাম—মাবুদ। না চাইতে দুনিয়ার সব রকমের সুখ তুমি আমাকে দিয়ে রেখেছো।

দুনিয়ায় যদ্দিন থাকি আমার নিজের জন্য আর কিছুই চাওয়ার নেই। শুধু আমার সন্তানদের তোমার রহমতের ছায়ার নিচে আশ্রয় দাও। তাদের হৃদয়ে তোমার ভয় সঞ্চার করো, তোমার প্রতি ভালোবাসাা সৃষ্টি করো। মানুষ সর্বাবস্থায় অসহায়, তুমি তো অসহায় নও। মানুষের কাছে অনেক কিছুই দুর্বোধ্য, অনেক কিছুরই সমাধান নেই; কিন্তু তুমি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

মোনাজাত শেষ করেও কোরআন মজীদ নিয়ে বসেছি। পড়তে পড়তে সকাল হয়ে গিয়েছিল। আমার যেন কেন মনে হয়েছিল—দুনিয়ার জন্য এটিই আমার শেষ রাত, শেষ সকাল, শেষ দিন। এগারোটার দিকে ষ্ট্রেচার নিয়ে ওরা আসবে, আমাকে স্বামী, পুত্র-কন্যা থেকে বিদায় করিয়ে নিয়ে যাবে। থিয়েটারে ঢোকার আগেই 'এনেস্থেসিয়া' দেবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তোর সাথে আমার দেখা হয়ে যাবে।

আসলে তোর ওই জায়গাটা কেমন বুবু? এতো লোক যাচ্ছে, আজ পর্যন্ত একজন লোকও সেখানকার কোনো খবর দেয়নি। কতো বড় বড় লেখক, সাংবাদিকরা গেলেন, আজও তো কেউ একটা রিপোর্টও পাঠালো না। যে জায়গাটাতে এতোদিন থাকলো-খেলো, বসবাস করলো, যে জায়গায় দালান-কোঠা তোলার জন্য, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য জীবনের আরামকে হারাম করে, হারামকে হালাল জেনে এতো কিছু গড়ে গেলো, ওখানে গিয়েই সে জায়গার কথা ভুলে গেলো?

এই যে আমি তোকে লিখছি—এটাও তো ঠিক একপক্ষীয় লেখা। আমি তো আমার সব বিবরণ তোকে লিখলাম, প্রাণ খুলে মনের কথা সবই তোকে জানালাম, কিন্তু তুই কি করে জানাবি? আমি তো এ-ও জানি না যে, তুই কি অবস্থায় আছিস। কারো চিঠি পড়ার মতো পরিবেশ সেখানে আছে কিনা, কারো চিঠি পড়ার মতো সময় সেখানে মেলে কিনা।

আচ্ছা বুবু, তোকে ওখানে যাবার সংবাদটি জানানোর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যাকে পাঠালেন, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন? শুনেছি তিনি নাকি খুব ভয়ংকর। তুই কেমন দেখছিস তাঁকে? তোর চারপাশে তখন যারা বসেছিল তারা তো তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি। কি করে আল্লাহ তোর চোখের পাওয়ার এমন করে দিলেন-যা দিয়ে তুই তাঁকেও দেখেছিস আবার তোর চার পাশে বসে থাকা মানুষগুলোকেও।

এরপর কি করলেন তিনি! শুনেছি ঈমানদার পরহেজগার ও খোদাভীরু লোকদের রূহ নাকি স্পেশালভাবে সুগন্ধী রুমালে করে বহন করা হয়। পথে পথে ফেরেস্তারা সম্ভাষণ জানান। এরপর একে একে তাকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করান।

আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের পরোয়া না করে শয়তানের তাবেদারী করেছে তাদের রূহ নেয়ার জন্য আজরাঈল (আঃ) নাকি এক বীভৎস্য রূপ ধরে আসেন। অনেক কষ্ট দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে রূহ বের করে দুর্গন্ধযুক্ত কম্বলে মুরিয়ে আকাশের দিকে নিয়ে যান। তখন আকাশের ফেরেশতারা তাকে ধিক্কার দিতে দিতে দুর্গন্ধের কারণে উপরে যাওয়ার দরজা বন্ধ করে ফেলেন। সে ব্যক্তির কারো সাথে দেখা হওয়ার তাই প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ভালো কথা, আব্বার সাথে তোর দেখা হয়েছিল?

www.pathagar.com

আব্বা কেমন আছেন রে! তুই কি তাঁকে বলেছিস—মাসুমের সাথে আমার বিয়ের কথা, আমার সুখ-শান্তির কথা, আমার সফলতার কথা!

ওই জগতে পৌঁছুবার প্রথম স্টেশনে তোর 'ইমিগ্রেশন'টা কেমন হয়েছিল? ওরা কি 'দ্বীন তেরা কেয়া হ্যায়? রব তেরা কোন হ্যায়?' বলেছিল!

ইয়া আল্লাহ্! তুই তো আবার উর্দু জানিস না। মনে নেই সেই যে একবার পাঞ্জাবী সোলজাররা আমাদের ট্যাক্সী আটকে রেখে এটা ওটা চেক করলো, আমাদের ব্যাগ-ট্যাগ সব খুলে খুলে দেখে ট্যাক্সীর গায়ে থাপ্পর মেরে বললো—'যাও, ফওরান যাও।'

সোলজারদের কথা শুনে তুই তোর বরকে বলেছিস—'ওরা ডালে ফোড়ন দেবার কথা কি বললে গো?'

তোর বর বলেছিল—'স্টুপিড! ডালে ফোড়ন দিতে বলেনি, কুইকলী যেতে বলেছে।'

তাই ভাবছি, ওখানের 'ইমিগ্রেশনে' মুনকার-নকীর যা প্রশ্ন করেছিলেন তা তুই ঠিক মতো বুঝে নিয়ে উত্তর দিতে পেরেছিলি তো। তোর পাসপোর্ট ক্লিয়ার ছিল তো! শেষতক তোকে কোন্ গ্রুপে ফেললেন তাঁরা? তোর ঘরটা কেমন হলো! অবশ্য তোর তো একটা ভালো ঘর ওখানে তৈরী হবার কথা। দুনিয়ার কোনো মসজিদের একটা ইটের জন্য দান করলে ওখানের প্রাসাদের জন্যও নাকি একটা ইট বসানো হয়। তোর তো আবার মাদ্রাসা-মসজিদে দান করার অভ্যাস ছিল।

তুই কি ওখানে কাউকে আগুনে পুড়তে দেখেছিস? শুনেছিস কাউকে ভারী গদা দিয়ে পেটানোর শব্দ? অবশ্য তোর তো ওসব দেখার কথা নয়, আল্লাহর অনুগত যারা ওসব তো তাদের জন্য নয়।

বুবু, আমাদের এখানে আজকাল আবার একদল লোক বলছে-কবরে নাকি কোনো আযাবই হবে না! কবরের প্রশ্নোত্তর, কবরে দু'দিকের মাটি চাপাচাপি, কবরের শাস্তি—ওসবই নাকি মিথ্যে কথা। কবরে নাকি কেউ জাগবেও না। আশ্চর্য! আজও কবর থেকে কেউ ফিরে এসে কবরের শাস্তির কথা বলেনি বলেই কিছু লোক 'কবর আযাবের' কথা বিশ্বাস করবে না!

বুবু, তুই বল এটা কি সত্যি হতে পারে? আমি তো জানতাম, 'ইন্তেকাল' মানে ট্রান্সফার—কোনো কিছুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাখা, সহজ বাংলায় যাকে বলে 'স্থানান্তর'। এ জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় যাচ্ছে বলেই চোখ বন্ধ হবার সাথে সাথে তাকে গোসল দিয়ে পরিষ্কার নতুন কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে পাঠানো হয়। সে নাকি সবই দেখে, শুনে, বোঝে ও অনুভব করে। শুধু শরীরের কোনো অংশকে নাড়াচাড়া করতে পারে না। কারণ যে যন্ত্রের কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ 'মুভ' করতো সে যন্ত্রটির সুইচ অফ করে রাখা হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। কবরে যখন নেয়া হয়, রাখা হয়, কবর বন্ধ করা হয়—সবই সে দেখে, কিন্তু সে কিছু বলতে পারে না। চিৎকার দিতে চায়, কিন্তু কেউ তার সে চিৎকার শুনতে পায় না।

কবর বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথেই নাকি কবরের ভেতরে আওয়াজ করতে করতে 'মুনকার-নকীর' নামে দু'জন ফেরেস্তা আসেন অপর দিকে যে রাস্তার মতো খুলে দেয়া হয় তা দিয়ে। এর পরই প্রশ্ন করতে থাকেন তারা।

বুবু, আমরা যা যা পড়েছি তা তো সবই সত্যি তাই না? ওখানে কি পোশাক তোকে দেয়া হয়েছে? সেই যে পড়েছি—প্রশ্নের উত্তর ঠিক হলে, বেহেস্তী পোশাক

www.pathagar.com

পরিয়ে দেয়া হবে, আর উত্তর ঠিকমতো দিতে না পারলে আগুনের পোশাক পরানো হবে। বেহেস্ত আর দোযকের ফায়সালা তো শেষ বিচারের পরেই হবে, তবে যে ভুল পাসপোর্ট নিয়ে নতুন জায়গাতে ঢুকেছে—যে প্রশ্নের সোজা সহজ উত্তরটা দিতে পারলো না বা মালিকের নামই চিনলো না তাকে তো আর সরাসরি মালিকের মেহমান হিসেবে আপ্যায়ন করা যায় না। তার বিচার হবে। বিচারে হয়তো জেল হবে। কিন্তু বিচার হবার পূর্ব পর্যন্ত হাজতে থাকতে হবে না! আর হাজতটা তো আর আরাম-আয়েসের জায়গা নয়। কবরকে যদি হাজত বলা যায় তাহলে ওখানে আযাব বা কষ্ট পাওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক।

তোর তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। তুই-ই বল বুবু, কবর আযাবের কথা কি অস্বীকার করার বা অবিশ্বাস করার কোনো উপায় আছে?

ইতিমধ্যেই আমার শ্বশুর সেখানে গেলেন। তাঁকে অবশ্য তুই চিনিস না। তিনি অনেক বড় আলেম ও বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। আম্মার সাথে তো তোর অবশ্যই দেখা হয়েছে। আম্মাকে বলিস. তাঁর কথা আমি ভুলিনি। তাঁর কারণে-তার দোয়াতেই আমি মাসুমকে পেয়েছিলাম। মায়ের ঋণ কেউ শোধ করতে পারে না, তবে আমি আম্মার কাছে অন্যদের তুলনায় একটু বেশীই ঋণী।

হঠাৎ করে গত নভেম্বরে মেঝো ভাইও গেলেন। আমি তো ওমরাহ করতে গিয়ে এখানে-ওখানে সবার জন্য কিছু কিছু চেয়ে তাঁর কাছে হাত পেতে বসে রয়েছি। আমি তখনো জানতাম না যে, মেঝো ভাই ততক্ষণে রওনা করেছেন এবং তোদের ওখানে পৌঁছেও গেছেন। মেঝোভাই অবশ্য খুবই ভালো অবস্থায় থাকবেন বলে আমার বিশ্বাস। কারণ তিনি অনেক সম্পদ জমা করে রেখেছিলেন ওখানের জন্য। যাবার আগে এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা ইত্যাদি করে রেখে গেছেন 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার' হিসেবে। যারা এ ধরনের ব্যবস্থা রেখে যায় তারা তো অবশ্যই অন্যদের তুলনায় ভালো অবস্থায় থাকবেন। মেঝো ভাই'র সাথে নিশ্চয়ই তোর দেখা হয়। মেঝো ভাইকে বলিস, ভাবী সব সময় তাঁর জন্য কান্নাকাটি করেন।

আচ্ছা শোন্, তোর সাথে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়েছিল? কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম, কে নাকি রবী ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখেছে—তিনি বেহেস্তে বসে আঙুর খাচ্ছেন। তোদের ওখানের নিয়ম-কানুন তো জানি না। কি জানি ভাই, যা লম্বা লম্বা দাঁড়ি তাঁর! কে জানে ফেরেস্তারা আবার পাঞ্জাবী সৈন্যদের মতো তাকে মুসলমান ভেবে বসলো কিনা!

পাঞ্জাবী সৈন্যরা নাকি যুদ্ধের সময় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবিকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিকে চুমু দিয়ে বুকে চেপে ধরেছিল। তারা লম্বা লম্বা দাড়ি দেখে রবী ঠাকুরকেই ভেবেছিল নজরুল, আর দাড়ি মুড়ানো নজরুলের ছবিকে ভেবেছিল রবীন্দ্রনাথ। তারা জানতো না, দাড়ি না রেখেও একজন লোক ভালো মুসলমানের কীর্তি রেখে যেতে পারে। তারা জানতো না, শুধু দাড়িই ঈমানদারী নয়, শুধু মাত্র দাঁড়িই এজন ঈমানদারের আইডেন্টিফিকেশন নয়। দেখিস বুবু, তুই আবার এ ধরনের ভুল-টুল করিস না। আগে তো আমিও মনে করতাম, দাড়ি মুসলমান পুরুষের প্রকৃত পরিচয়। এখন এই লণ্ডনে এসে কতো জাতের, কতো ধর্মের লোক যে দেখলাম,

www.pathagar.com

এমনকি বহুলোক আছে যারা 'ধর্ম' আবার কি—খোদাকেই বিশ্বাস করে না—অথচ দিব্যি দাড়ি রাখছে।

তোর ছেলের সাথে গত বছর দেশে গেলে একবার দেখা হয়েছিল। শুকে শুকে দেখলাম তোর গন্ধ পাই কিনা।

একটা কথা কি তোকে বলবো বুবু!

তোর আপনজনদেরকে দেখে আমার মনে হয়নি তারা তোকে তেমন স্মরণ করে। আসলে সেটা তো তুই-ই ভালো জানিস্। শুনেছি, সবচেয়ে বড়ো 'সাদকায়ে জারিয়া' যেটাকে আমি একটু আগে 'স্ট্যান্ডিং অর্ডার' বললাম—তা নাকি হচ্ছে 'সু-সন্তান'। দুনিয়াতে যারা এমন সন্তান রেখে যায়—যারা দুনিয়াতে খোদার আদেশ-নিষেধকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেয় এবং প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য করে তাদের এ সমস্ত কাজের সওয়াব বাবা-মা কবরে থেকেও পেতে থাকেন।

তোর লোকেরা তোর জন্য দোয়া করে কিনা জানি না, তুই-ইবা আমাকে তা কি করে জানাবি! তোর সাথে আমার এ চিঠি তো হচ্ছে 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক'-এর মতো।

আজ তোর ছেলের কথা মনে পড়ার সাথে সাথে আমার নিজের জন্যও ভয় হচ্ছে। আমি যখন এখানে থাকবো না, যখন আমারও তোর কাছে যাবার ডাক এসে যাবে তখন আমার ছেলে-মেয়েরা কি আমার জন্য দোয়া করবে? খোদার কাছে কখনো তাদের দু'হাত তুলে তারা কিছু কি চাইবে আমার জন্য?

যারা এ প্যারাটি এখন পড়ছেন তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, সবিনয় নিবেদন, যখনি আপনি পড়বেন কথাগুলো, আমার জন্য অন্ততঃ এটুকু বলবেন—

'আল্লাহুম্মাজ আলহু মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ আলহু মিনাল মুতাতাহ্ হেরীন।'

বুবু, তুই কি ভাবছিস, আমি লোকের কাছে ভিক্ষে চাইছি! আসলে আমার জন্য এ দোয়া পড়লে আমি যেমন একটু সওয়াব পাবো, যারা পড়বেন তারাও তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন না।

যে মেয়েকে দুনিয়াতে আনতে গিয়ে তোকে এখান থেকে যেতে হলো সে কিন্তু এখন বেশ বড় হয়েছে। তোর বরেরও নাকি ক'দিন আগে পাইলসের অপারেশন হয়েছে। রোগা-পটকা লোকটার নাকি অসুখই ছাড়ে না। সাবধান থাকিস্, কবে না আবার তোর ওখানে গিয়ে হাজির হয় আর তোকে বলে ওঠে—'স্টুপিড! ফওরান কিঁউ চলি আয়ি?'

তুই বলবি—'আরে না—না, এখানে ফোঁড়ন দিতে হয় না, ফোঁড়ন দেওয়াই থাকে।'

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বুবু

খাদিজা আখতার রেজায়ী